

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্ব অঞ্চল বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে (ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং অবিভক্ত বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৬ সালের ২৫ নভেম্বর অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা বাংলাকে দুটো অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পূর্ববাংলার আইনসভার জন্য নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দেয়। ৫ আগস্ট (১৯৪৭) অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে খাজা নাজিমউদ্দিন ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন। সুতরাং খাজা নাজিমউদ্দিন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ববাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন পূর্ববাংলার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

এই মন্ত্রিসভা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৪ আগস্ট পূর্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যকেই স্বাধীন পূর্ববাংলার প্রথম মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্বত্বাবতই নবীন রাষ্ট্রের জন্মেলগ্নেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সমরোতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিম্মাহ মৃত্যুবরণ করলে খাজা নাজিমউদ্দিন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যবৃন্দ সংসদীয় পদ্ধতিতে একজন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। কারণ গভর্নর জেনারেল তাঁর মনোনীত নূরুল আমিনকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করার জন্য পূর্ববাংলার গভর্নরকে নির্দেশ দেন। গভর্নর সে অনুসারে নূরুল আমিনকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে সংসদীয় রীতিনীতি চর্চার বিষয়টি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক মুসলিম লীগ সদস্য স্ফুর্ক হন। এমনি পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় পর পর কয়েকটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

পাঠক্রমের উপ অধ্যায়ে আছে-

ক. মুসলিম লীগের শাসন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংগ্রাম এবং খ. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯।

আমরা এখানে প্রথমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরিচয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে কী ধরনের রাজনৈতিক ও

ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দল গঠনের প্রারম্ভিক জন্ম আবেদনের রাজনৈতিক চরিত্র।

আওয়ামী মুসলিম লীগের [পূর্ববর্তী কালের আওয়ামী লীগ] প্রতিষ্ঠা ছিল এ পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে তা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারপর ভাষা আন্দোলন আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। ‘ঘ’ উপ অধ্যায়ে পাঠক্রমে আছে যুক্তফুন্ট ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং বিবরণেই মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তফুন্টের সংগ্রামের চিত্রটি পরিস্কৃতিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল : উৎপত্তি, বিকাশ, ভাঙ্গন ও অবক্ষয় পূর্ববাংলার জন্মগ্রেহের দলসমূহ (১৯৪৭-৪৮)

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় যে-সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম পূর্ববাংলায় চালু ছিল সেগুলো হচ্ছে মুসলিম লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি। এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির নামমাত্র অস্তিত্ব ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অখণ্ড বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলটি ১১৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে ১১৪টি আসনে জয়লাভ করে। বাকি ৫টি আসনে জয়লাভ করে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর অবিভক্ত বাংলার সরকার গঠন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সে সময় বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছিল। পার্টির সম্পাদক আবুল হাশিম এবং মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একদিকে, আর পার্টির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ এবং খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন অন্যদিকে। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করলে খাজা নাজিমউদ্দীন রাজনীতি থেকে নিপত্তি হন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রশ্নে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড নাজিমউদ্দীন-আকরাম খাঁ গ্রুপকে সমর্থন দিলে তাদের গ্রুপটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের অখণ্ড বাংলা গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। বাংলা দ্বিতীয় হয় এবং পূর্ববাংলা পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশে কে সরকার গঠন করবেন এই প্রশ্নে ৫ আগস্ট ১৯৪৭ বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে যে তোটাভুটি হয় তাতে খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ববাংলা প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তার নিযুক্তিতে দলের মধ্যেই একটি বিরোধী অংশের জন্ম হয়। দুই অংশের মধ্যে আদর্শগত মতভেদও ছিল। যেমন খাজা নাজিমউদ্দীন গ্রুপের উদ্দেশ্য ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করে মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা। এর বিপরীতে অন্য অংশের লক্ষ্য ছিল পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্ত্বাসন লাভ ও পাকিস্তানকে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। মুসলিম লীগের সরকারবিরোধী অংশের নেতা-কর্মীরা দেশভাগের পূর্বে এবং পরে কয়েকটি নতুন দল গঠন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল :

(১) গণআজাদী লীগের জন্য

নাজিমউদ্দীন বিরোধী অংশটি ছিল মূলত তরঙ্গ কর্মসূলি। বাম রাজনৈতির দিকে তাদের কিছুটা বৌকও ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই তারা একটি আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সংগঠনটির নাম ছিল গণআজাদী লীগ (People's Freedom League)-এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন কমরুদ্দিন আহমদ। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও রাগের অভিযুক্তি থেকেই এই সংগঠনের জন্য। কিন্তু এই সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এর কারণ : প্রথমত, আহ্বায়ক কমরুদ্দিন আহমেদের কর্মবিমুখ নিক্ষিয় ভূমিকা, কারাগার-ভীতি ও ত্যাগী মনোভাবের অভাব; দ্বিতীয়ত, সমগ্র দেশে উৎকট সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া, তৃতীয়ত, তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতি।

(২) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের জন্য

স্বাধীনতা লাভের এক মাস পরেই ৬-৭ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) পূর্ববাংলার তরঙ্গ-যুবক রাজনৈতিক কর্মসূলি তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপক্ষা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বেচারাম দেউরিস্থ বাসভবনের হল কামরায় একটি যুব সম্মেলনে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠিত হয়। এর সভাপতি নির্বাচিত হন তসাদুক আহমদ চৌধুরী।

পাকিস্তান যুবলীগ বারো দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে। উক্ত কর্মসূচীগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে। আগামী অক্টোবরের ব্রিটিশ উপনিবেশ সম্মেলনে যোগদান করা চলিবে না। ব্রিটিশ আমলের কোনো ইংরেজ অফিসারের পেনশনের খরচ পাকিস্তান সরবার বহন করিতে পারিবে না। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের স্টার্লিং পাওনা কড়ায়-গুড়ায় বুবিয়া লইতে হইবে-কোনোরকম দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করা চলিবে না।
২. প্রাণ্বয়ক্ষদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নৃতন গণপরিষদ মারফত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে।
৩. ভাষার ভিত্তিতে স্বয়ং শাসন অধিকার সম্পন্ন প্রদেশ গড়িবার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিলয়া লইতে হইবে।
৪. সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।
৫. জনগণের স্বার্থে পারম্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে।
৬. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। কৃষকের খাণ মণ্ডকুফ করিতে হইবে। ক্ষেত্রমজুরদের ন্যায্য মজুরি দিতে হইবে।
৭. বড় বড় শিল্প, বড় ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করিতে হইবে। শ্রমিকদের খাটুনির সময় আট ঘণ্টা বাধিয়া দিতে হইবে এবং বাঁচার মতো

- মজুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে ।
৮. ব্যাংক, চা-বাগান, খনি ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াঙ্গ করিতে হইবে । মার্শাল প্র্যান অথবা অন্য কোনো বিদেশী মূলধন জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তে গ্রহণ করা চলিবে না ।
 ৯. বিনাব্যয়ে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন শিক্ষা চালু করিতে হইবে ।
 ১০. রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।
 ১১. জনগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জনগণের সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে ।

১২. নারীদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে ।
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ একরামুল হক কর্তৃক এই ইস্তাহার উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

(সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০২-১০৩) ।
'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা খোলা হয়, কিন্তু তৈরি পুলিশ নির্যাতন ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গুণাদের অত্যাচারের ফলে ১৯৪৮ সালের শেষদিকে এই সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে ।'
(দ্রষ্টব্য : এই, পৃ. ১০৮, পাদটীকা) ।

(৩) তমদুন মজলিশ

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'তমদুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় । রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সূচনায় এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ।

(৪) অন্যান্য দল

ব্রিটিশ আমল থেকে পূর্ববাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগী সংগঠনরূপে 'রেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'রেল কর্মচারী লীগ' প্রতিভাব কার্যকর ছিল । কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগী কৃষক সংগঠন হিসেবে 'কৃষক সভা' সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, যশোর, খুলনা প্রতিভাব এলাকায় কার্যকর ছিল ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন-এর সরকার মুসলিম লীগ বিরোধী সকল দলকে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি ছমকিস্বরূপ ঘড়্যন্ত্রকারীদের দলরূপে অভিহিত করে এবং সংগঠনসমূহের ওপর নানাভাবে হয়রানি করতে থাকেন । ফলে এসব দলের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয় ।

(৫) মুসলিম লীগের অবক্ষয়

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭- এর ডিসেম্বরে করাচীতে । উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বিভক্ত করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । উক্ত কাউন্সিল

অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়ক সঙ্গে পরিষ্কৃত ভূরূর প্রস্তাব দিলে তা নাকচ হয়ে যায়। পাকিস্তান মুসলিম লীগের গঠনতত্ত্ব প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত গঠনতত্ত্ব ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। নতুন গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী মন্ত্রীদের কোনো সাংগঠনিক কর্মকর্তার পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে দলের আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। জিম্বাহর জীবন্দশায় মুসলিম লীগ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। তার মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

এইভাবে পাকিস্তানের জন্মগ্রন্থ থেকে মুসলিম লীগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের হাতে। তাদের কাউন্সিলের মোট ৪৬৫ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত করা হয় মাত্র ১৮০ জন। উপরন্ত জিম্বাহর সময় মুসলিম লীগে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা স্থগিত রাখা হয়। এইভাবে দলীয় নেতৃত্বে স্বেচ্ছাচারিতা দেখাতে থাকলে দলের প্রগতিশীল কর্মী-নেতাদের মধ্যে অসম্ভুষ্টির সৃষ্টি হয়। দলের মধ্যে ক্ষোভের সংঘার হতে থাকে। এ সকল ক্ষোভ-অসম্ভুষ্টি উপেক্ষা করে দলের নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়ে যায়। দলের গঠনতত্ত্ব সংশোধন করে (১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে) প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে দলের সভাপতি নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে সভাপতির পদ প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে যায়। খাজা নাজিমউদ্দীন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এরা সকলেই দলের সভাপতি ছিলেন। এতে দলে গণতত্ত্ব চর্চা ব্যাহত হয়। দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে— এর পরিবর্তে সরকারই দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। দল সরকারের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হয়।

এমতাবস্থায় দলের ক্ষুক নেতা-কর্মীরা দল থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল গঠন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে মানকী শরিফের পীরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (মে, ১৯৪৯) এবং পূর্ববাংলায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ (২৩ জুন ১৯৪৯) গঠিত হয়। এইভাবে মুসলিম লীগের পতন সূচিত হয়। পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে যায়। দলের এই দুর্বলতা স্পষ্ট হয় ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে। উক্ত উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতা খুরুম খান পঞ্জী বিপুল ভোটে পরাজিত হন আওয়ামী-মুসলিম লীগের তরুণ কর্মী সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থিত শামসুল হকের নিকট। এই পরাজয়ে শাসকগোষ্ঠী এত বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হন যে তারা পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অন্য ৩৪টি আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করেননি এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তারা তা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখেন।

মুসলিম লীগের শাসকগোষ্ঠীর এই বৈরাচারী মনোভাব দলের মধ্যে এত বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, অনেক বিক্ষুক নেতা-কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী

মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এইভাবে পুরাতন প্রাচীন কর্মসূচি কর্মসূচি দল ত্যাগ করায় দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। দলের মধ্যেও অন্তর্দৰ্শ শুরু হয়। নূরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে হামিদুল হক চৌধুরী একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করেন। দলের অভ্যন্তরে কোন্দল এমন খারাপ পর্যায়ে পৌছে যে, পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম ঝা ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের কোনো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়নি।

মওলানা আকরাম ঝা পদত্যাগ করলে ১৯৫২ সালের ২৩ আগস্ট পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিল অধিবেশনে নূরুল আমিন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি পূর্ববাংলায় বিতর্কিত হওয়ায় তার পক্ষে মুসলিম লীগকে পূর্ববাংলায় শক্তিশালী করা সম্ভবপর হয়নি। ভাষা-আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা হারায়। এর প্রভাব পড়ে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময়। ঐ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার রাজনীতি থেকে চিরবিদায় নেয়। নির্বাচনের পর নূরুল আমিন সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন (৩-১-১৯৫৫)। তার দলীয় সহকর্মীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে তিনি প্রদেশে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে, বিহারি-মোহাজের পুনর্বাসন করতে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

নূরুল আমিনের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। উক্ত অধিবেশনে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগে ধস নামে। নূরুল আমিনের সঙ্গে আরো পদত্যাগ করেন পার্টির সহ-সভাপতি খাজা হাবিবুল্লাহ, ট্রেজারার এম.এ. সলিম, মুগ্ধ-সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ও মঙ্গলুদীন চৌধুরী এবং প্রচার সম্পাদক সবুর খান। দৈনিক সংবাদ- যা এই দলের মুখ্যপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল- তা এই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এদিকে কেন্দ্রেও মুসলিম লীগে কোন্দল দেখা দেয়। দ্বিতীয় গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে মুসলিম লীগ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হয়। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ সালের ২৮-২৯ জানুয়ারি পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে আবদুর রব নিশতার সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ডা. খান সাহেবের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে। এই সুযোগ গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা। তিনি তার অনুগত একটি দল গঠনের অভিপ্রায়ে মুসলিম লীগ থেকে কিছু গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে গঠন করেন রিপাবলিকান পার্টি (মে, ১৯৫৬)। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ দ্বিখাবিভক্ত হয়। ২২ জন গণপরিষদ সদস্য মুসলিম লীগ থেকে রিপাবলিকান পার্টির পার্টিতে যোগ দেন। ফলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথমবার মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর আই.আই. চুন্দীগড়ের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আরেকবার মাত্র দুই মাসের জন্য

পাকিস্তানে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেও ১৯৫৮ সালের প্রথম একটা প্রতিরক্ষামূলক আইন পারিত করতায় যেতে পারেনি।

সামরিক আইন চলাকালীন (১৯৫৮-৬২) সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত থাকে। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। আইয়ুব খান নিজেও একটা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার অভিপ্রায় অনুযায়ী চৌধুরী খালিকুজ্জামান ১৯৬২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর করাচীতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশন আহ্বান করেন এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করেন। ১৯৬৩ সালে আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, মোনেম খান কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদানের পুরস্কারস্বরূপ এরা প্রত্যেকে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব ভোগ ছাড়াও ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদের স্পিকার এবং মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়েছিলেন। কনভেনশন মুসলিম লীগে আইয়ুবের একান্ত আজ্ঞাবহ এবং অনুগতরাই সমবেত হয়েছিল। আইয়ুবকে খুশি রাখতেই এই দলের সদস্যরা সদা ব্যক্ত থাকতেন। ফলে সংগঠন হিসেবে কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী করার কোনো উদ্যোগ ছিল না। আইয়ুবও এই দলকে শক্তিশালী করতে চাননি। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত মেনিফেস্টোর শিরোনাম দিয়েছিলেন ‘মাই মেনিফেস্টো’ অর্থাৎ একটি দলের নয়, ব্যক্তি আইয়ুবের মেনিফেস্টো ছিল। কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ুবের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন দিয়েছে, প্রতিবাদ করেনি। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে এই দলের কোনো ভূমিকা ছিল না।

কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠনের পর মুসলিম লীগের প্রাক্তন নেতারা গঠন করেছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ। ১৯৬২ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকায় আয়োজিত কাউন্সিলে এ দল গঠিত হয়। এর সভাপতি নিযুক্ত হন খাজা নাজিমউদ্দীন। তার মৃত্যুর পর (১৯৬৪) মিয়া মমতাজ দৌলতানা এর সভাপতি হন। এই দলটি মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের নিয়ে গঠিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান এর নেতা ছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিন। কাউন্সিল মুসলিম লীগ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ১৯৬৫-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই দল মিস. ফাতিমা জিল্লাহকে সমর্থন করেছিল। পিডিএম, ‘ডাক’ প্রভৃতি রাজনৈতিক জোট এই দলে যোগদান করেছিল। তবে ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্ত্বাসনের প্রতি এই দলের সমর্থন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ বিপ্লিত হোক তা এই দল চায়নি। ১৯৭০-এর নির্বাচনে এই দল মাত্র একটি আসন লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুক্তে এই দল পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দোহাই দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এমনকি ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত ‘শান্তি কমিটি’র আহ্বায়ক হয়েছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রধান খাজা খয়েরউদ্দিন।

মুসলিম লীগ বিভক্তির সময় কাইয়ুমপুরী নামক আরেকটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলিম লীগের এই অংশ কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ নামে পরিচিত ছিল। এই দলটিও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা প্রাপ্ত করেছিল।

(৬) আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে আওয়ামী লীগ)-এর প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যেই মুসলিম লীগের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অবাঙালিরা নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তারা নানান উপায়ে সুবিধা পেতে থাকে। মুসলিম লীগের মধ্যেও শাসকগোষ্ঠীর অনুগত একটি অংশ সকল সুযোগ সুবিধা জোগ করতে থাকে। স্বভাবতই নাজিমউদ্দীন পন্থীদের বিরোধী একটা অংশের মধ্যে দারুণ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম লীগের এই ক্ষুক্ত অংশটুকু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার ১৫০নং মোগলটুলিতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে ‘ওয়ার্কার্স ক্যাম্প’ নামে একটা গ্রাম গঠন করে। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রামের সঙ্গে শীঘ্ৰই মুসলিম লীগ নেতাদের বিবাদ উৱে হয়। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রাম চেয়েছিল দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে। দলের চাঁদা আদায়ের রসিদ বই ছিল তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ-এর নিয়ন্ত্রণে। তিনি ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রামকে রসিদ বই দিলেন না। তখন ক্যাম্প গ্রাম কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সভাপতি খালেকুজ্জামানের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু খালেকুজ্জামান আকরাম খাঁ-গংদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানালেন। এর প্রতিবাদে ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রাম ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকাস্থ কে.এম. দাস লেনের বিখ্যাত রোজ গার্ডেনে সারা পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্মী সদস্যদের এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে পূর্ববাংলার প্রায় সব জেলা থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। সম্মেলনের ঘটনা প্রসঙ্গে আবু আল সাঈদ লিখেছেন :

বিভিন্ন স্তৰ থেকে পাওয়া থেকে ধারণা করা যায়, তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাতে। এতে সভাপতিত্ব করে আতাউর রহমান খান। আবদুল হামিদ খান ভাসানী উপ্রোধনী ভাষণ পাঠ করেন। এ.কে. ফজলুল হক তখন পূর্ববাংলা সরকারের অধীনে এডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত।

এই সম্মেলন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় যখন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ সরকার প্রদেশের শাসন পরিচালনায় ব্যর্থতার নানা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আবু আল সাঈদ লিখেছেন :

১৯৪৯ সালের মে মাসের উক্ত থেকেই পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব চলছিল....ঢাকা শহরে পানির অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্যের আকাশচূম্বিতা, আমে গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ। কমিউনিস্টদের তৎপরতা...রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক।...

এমন পরিস্থিতিতে সম্মেলনে ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি; আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহমদ এবং আলী আমজাদ খান সহ-সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও খন্দকার মুশতাক আহমেদ যুগ্ম-সম্পাদক

নির্বাচিত হল ১২৫ নবগঠিত পার্টির উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা এবং দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসন, পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেয়া, পার্টিশালকে জাতীয়করণ করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে জমিদারি ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা। ২৬

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধীদলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল-এই দুই ধারার রাজনীতিবিদ ছিলেন। প্রথম অংশ মুসলিম লীগের ন্যায় গতানুগতিক ধারার রাজনীতি করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রগতিশীল অংশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দল গঠনের প্রয়াসী ছিলেন। এরা পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে পার্টিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল অংশের মনমানসিকতা থেকে সাম্প্রদায়িক চেতনার অবসান না-ঘটায় তারা 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার বিরোধী ছিলেন। তাই পার্টির একতা বজায় রাখতে মওলানা ভাসানী 'মুসলিম' শব্দ রেখেই পার্টির নামকরণ করে। তাহাড়া মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বৃক্ষ করতে মুসলিম শব্দযুক্ত বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল। পার্টি গঠনের সময় সোহরাওয়ার্দী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে বসতি করে আইন ব্যবসা ও জিনাহ আওয়ামী লীগ নামে একটি দল সংগঠিত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী-মুসলিম লীগ গঠিত হলে সোহরাওয়ার্দী জিনাহ-আওয়ামী লীগকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে দলটিকে জাতীয়রূপ দান করেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রহণ করেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের এক বছরের মধ্যেই পার্টি পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করে এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের ফলে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদ থেকে প্রত্যাহত হয়। এইভাবে প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি আন্দোলনমূখ্য দলে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারিতে যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং (মুসলিম) ছাত্রলীগ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে ক্ষমতা থেকে এবং বাংলার রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগকে নির্বাসিত করে।

১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল মিটিংয়ে পার্টিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুসারে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং পার্টির নাম হয় আওয়ামী লীগ। তখন থেকে এই দলটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের একটি গণসংগঠনে পরিণত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং হিন্দু উৎসব প্রদর্শন সম্প্রদায়ের মাঝে জাতিক দলগুলি বিকাশ লাভের সুযোগ না-পাওয়ায় তারা অনেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ফলে এই দল পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পতন এবং আইযুবের আমলে এখানে তার দল- কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে না-পাওয়ায় আওয়ামী লীগ একক বৃহত্তম এবং শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাঙালিরা জনগতভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং উদার মতাবলম্বী হওয়ায় এখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দলগুলো যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, তেমনি বামপন্থী দলগুলো বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৬০-এর দশকে মওলানা ভাসানী আইযুব-বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বামপন্থী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়ায় তিনি ন্যাপকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হন। উপরন্তু ন্যাপের ভাঙনের (মোজাফফর ন্যাপ অর্থাৎ মঙ্কোপন্থী ন্যাপ এবং ভাসানী ন্যাপ অর্থাৎ চীনাপন্থী ন্যাপ) ফলে লাভবান হয় আওয়ামী লীগ। এর প্রমাণ ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টিই দখল করে। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে যে, আইযুব-বিরোধী আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, উন্সত্তরের গণআন্দোলন- ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগই নেতৃত্ব দেয়। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বেই এই দল ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন সাবজৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

সাংগঠনিকভাবে এই দলকে অনেক সংকট মোকাবিলা করতে হয়েছে। অনেক প্রবীণ নেতা এই দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছেন। যেমন মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ন্যাপ গঠন করেছেন। আতাউর রহমান খান গঠন করেছেন ন্যাশনাল লীগ। তারা অনেক নেতা-কর্মীকে আওয়ামী লীগ থেকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং নানান আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে এই দল দিন দিন শক্তিশালী হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ প্রবীণ নেতারা দল থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে শেখ মুজিবের উত্থান সহজ হয়েছে। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দান এবং সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা দেওয়ার কারণে তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছেন। গণভিত্তি থাকায় এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় আওয়ামী লীগ তার জন্মের ঘাট বৎসর পরেও আজ দেশের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে টিকে আছে।

(৭) কমিউনিস্ট পার্টি, যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল, ন্যাপ ইত্যাদি

ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্ত হয় এবং ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে ‘পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি’ গঠিত হয়। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। কেন্দ্রীয়

কমিটির সাথে পূর্ব পাকিস্তান শাখার যোগাযোগ ছিল কিন্তু বজ্রবন্দুর পৃষ্ঠা পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে সাংগঠনিক কাজ করতে থাকে। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন, যা 'বি.টি. রন্দীডে' লাইন নামে খ্যাত, অনুসরণ করছিল। তখন এই পার্টির নেতৃত্বে চলছিল তেভাগা আন্দোলন নাচোল ও হাজৎ এর কৃষক আন্দোলন। পূর্ববাংলার সরকার এসব আন্দোলন দমন করতে ব্যাপক হিংসাত্মক কর্মপদ্ধা গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার হাজার হাজার কম্যুনিস্ট নেতা-কর্মীকে কারাকান্দ করা হয়। কারাগারেও এসব বন্দির উপর চালানো হয় চরম নির্যাতন। এমনকি ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলার খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে সাতজন কমিউনিস্ট বন্দি নিহত হন। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের উপর সরকারি নির্যাতনের মুখে পার্টির প্রকাশ্য তৎপরতা বঙ্গ হয়। এ সব পার্টির অসংখ্য হিন্দুকর্মী দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। এমতাবস্থায় পূর্ববাংলায় অবস্থানরত কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীরা অন্য দলের মধ্যে চুকে পার্টির আদর্শ বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন অনেক মুসলমান নেতা-কর্মী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এমনকি তারা আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে জায়গা করে নিতে সমর্থ হন। তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে ৩৭ জনের মধ্যে ৯ জন ছিলেন কমিউনিস্ট। কিন্তু ১৯৫৫ পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে 'মুসলিম' শব্দ থাকায় সেখানে অমুসলমানদের অনুপ্রবেশ সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট নেতাদের উদ্যোগে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দলের সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী ও সেক্রেটারি অলি আহমদ। ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সামন্তবাদ বিরোধিতা, বিশ্বাস্তি, গণতন্ত্র, সকলের জন্য চাকুরির সুযোগ প্রভৃতি ছিল এই দলের মূলমন্ত্র। যুবলীগ ১৪ দফা ঘোষণা ও দাবিনামা ঘোষণা করে। উক্ত ঘোষণা ও দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. আমরা যুক্ত চাই না। দুনিয়ার যুবসমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কঠ মিলাইয়া আমরাও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইবো না। আমরা দাবি করিতেছি যে আমাদের সরকার যুক্তবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক।

এ কথাও আমরা ঘোষণা করিতে চাই- এটম অন্ত হইতেছে আক্রমণের অন্ত, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিচিঙ্ক করার অন্ত। তাই আমরা দাবি করিতেছি এটম অন্তকে বিনাশক্তি অবৈধ ঘোষণা করা হউক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তারপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

যে সরকার প্রথম কোনো দেশের বিরুদ্ধে এটম অন্ত ব্যবহার করিবে, সেই সরকার মানবজ্ঞানির শক্তি করিবে। আমরা তাহাকে যুক্ত-অপরাধে অপরাধী মনে করিব।

আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, দুর্মন্মের প্রচলনের প্রভৃতি অশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং গুপ্তনিবেশিক দেশগুলির আজাদীর আন্দোলনে ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা মারমুখো হইয়া এসব দেশে রক্তের শ্রোত বহাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে নিযুক্ত আমাদের কোটি কোটি ভাই-বোনদের অভিনন্দন ও অঙ্গুষ্ঠ সমর্থন জানাই।

২. আমরা চাই পাকিস্তান ব্রিটিশ কর্মনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক, যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ণ আজ্ঞানিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে, প্রত্যেকটি উপজাতি পাইবে কৃষ্ণির স্বাধীনতা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করিবে সমান নাগরিক অধিকার এবং আরবি হরফহীন বাংলা হইবে রাষ্ট্রভাষা।
৩. আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর চাকুরি ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারি ভাতা।
৪. আমরা চাই প্রাণবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন।
৫. আমরা চাই দেশের নিরস্করতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি, যুক্ত খাতে ব্যয় করাইয়া শিক্ষার জন্য বৃদ্ধিত হারে ব্যয়বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রাণবয়স্ক অশিক্ষিত যুব সমাজের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের উন্নতি, ছাত্রছাত্রীদের আবাসস্থল বৃদ্ধি ও ছাত্র-বেতন হ্রাস।
৬. আমরা চাই যুব সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং বর্তমানে যে-সমস্ত পাঠাগার ও ক্লাব আছে সেগুলিতে সরকারি সাহায্য, মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।
৭. আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রত্যুক্ত পরিমাণে ব্যয়বরাদ্দ। শহরে ও গ্রামে প্রচুর চিকিৎসালয় ও ব্যায়ামাগার স্থাপন।
৮. আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারি, জায়গিরদারি প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।
৯. আমরা চাই শ্রমিকের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি, দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসেবে সম্ভাব্য ৪৪ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ। শ্রমিক-যুবকদের জন্য খেলাধুলা, পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।
১০. আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াঙ্করণ, বড় বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।
১১. আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্ত বহন করিবার অধিকার।
১২. আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, বিনাবিচারে আটক রাখার কানুন নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর-শ্রমিকের, কৃষকের, মধ্যবিত্তের, ছাত্রদের, মেয়েদের, চাকুরেদের নিজ নিজ

সংগঠন গড়ার- সভাসমিতি করার ও মত প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার।

প্রত্যেকটি দলের নিজ মতানুযায়ী কাজ ও মত প্রকাশ করিবার বৈধ অধিকার।

১৩. আমরা চাই দেশের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার,

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা।

১৪. আমরা চাই সকল প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান।'

সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাতঙ্গ, পৃ. ২১২-২১৩।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্বও ছিল যুবলীগের নেতাদের হাতে। ফলে এই দলের অনেক নেতা-কর্মী জেল-জুলুমের মুখোমুখি হয়। অনেকে গ্রেফতার হন। আবার কেউ কেউ গোপনে চলে যান। ফলে যুবলীগে নামে কাজ করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৫২ সালের এপ্রিলে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামের ছাত্রফুন্ট এবং ৩১ ডিসেম্বর 'গণতন্ত্রী দল' (Democratic Dal) নামের রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। হাজী মোহাম্মদ দানেশ গণতন্ত্রী দলের সভাপতি ও মাহমুদ আলী এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। গণতান্ত্রিক দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল যেসব কমিউনিস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতে অনাগ্রহী ছিলেন কিংবা হিন্দু হওয়ার কারণে যাদের পক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্যপদ লাভ সম্ভব ছিল না তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

The destruction of imperialism and feudalism and agent (the Muslim League). the confiscation of all foreign capital investments in Pakistan, the nationalization of foreign banks and insurance companies, the abolition of the Zamindary System without compensation. and the distribution of excess land to the landless peasants.

১৯৪৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা সত্ত্বিকভাবে অংশগ্রহণ করে। কমিউনিস্ট সদস্যগণ যুজফুন্ট (আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে) এবং হিন্দু-সদস্যরা সংখ্যালঘু যুজফুন্ট, তপশিলি ফেডারেশন এবং গণতন্ত্রী দল থেকে নির্বাচনে অংশ নেন।

নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির চারজন সদস্য- পুর্ণেন্দু দত্তিদার, সুধাংশু বিমল দত্ত, বরুণ রায় ও অজয় বর্মণ সরাসরি প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে। অন্যান্য দলের ছাত্রছায়ায় যেসব কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে ছিলেন মোঃ তোয়াহা, হাজী মোঃ দানেশ, সেলিনা বানু, মাহমুদ আলী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ।

নির্বাচনের পর আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের সদস্যপদ সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করলে অনেক কমিউনিস্ট সদস্য আওয়ামী লীগে চুক্তে যান। কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রকাশ্য দল পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ভেঙে দেয়। ফলে এই দলের অনেক নেতা-কর্মী আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আওয়ামী লীগে কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ বিষয়ে

আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক সমর্থন ছিল না। এ বিষয়ে কেনেন চূড়ান্ত ও অনুষ্ঠানিক আলোচনা দুই দলের মধ্যে হয়নি। আওয়ামী লীগের কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ ছিল ‘একত্রিকা ও গোপনীয়’। আওয়ামী লীগে চুক্তে কমিউনিস্টরা মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে একটি গ্রুপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই গ্রুপ বিলুপ্ত-ঘোষিত গণতন্ত্রী দল এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগকে দিয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে থাকে।

পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয়বারের মতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (প্রথমবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ২৩ জুলাই ১৯৫৪)। তখন এই দল আভারগ্রাউন্ডে চলে যায়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৫৬ সালে কলিকাতায় গোপনভাবে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয়-কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তান কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি পায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন মণি সিংহ। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে ছিলেন মণি সিংহ, খোকা বায়ে নেপাল নাগ, বারীন দত্ত ও অনিল মুখার্জী। সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন শহীদুল্লাহ কায়সার, সুখেন্দু দত্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আমজাদ হোসেন ও কুমার মৈত্র।

(৮) ন্যাপ গঠন

১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তখন থেকেই আওয়ামী লীগের দুই নেতা সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সিয়াটো (সাউথ-ইস্ট-এশিয়া ট্রিটি অরগানাইজেশনস) এবং ১৯৫৫ সালে সেন্ট্রো (সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশনস) নামক দুটি সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। প্রথম চুক্তিভুক্ত দেশগুলি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং পাকিস্তান। দ্বিতীয় চুক্তিভুক্ত দেশগুলি পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক। এই চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ও চীনের চারদিকে মার্কিন-পক্ষের শক্তিবলয় সৃষ্টি করা। কমিউনিস্টরা এইসব সামরিক চুক্তির সমালোচনা করতে থাকে। তারা মওলানা ভাসানীকে তাদের দলে টানতে সক্ষম হন। এই গ্রুপ এমন একসময় শক্তিশালী হয় যখন সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছেন। মার্কিনঘৰে সোহরাওয়ার্দী উপরিউক্ত চুক্তিদ্বয়ের সমর্থক ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বার গ্রহণ করলে ভাসানী তাকে পাকিস্তানকে সকল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের বাইরে এনে আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো অনুযায়ী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে স্বায়ত্ত্বাসনের ভিত্তিতে সাবেক প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক

স্বায়ত্ত্বাসন দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমতিতে অবিচল থাকলে ভাসানী ক্ষুঁক হন। পার্টিতেও এর প্রভাব পড়ে। আওয়ামী লীগের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা কমিউনিস্টরা সত্ত্বিয় হয়ে উঠে। তারা ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি বিরোধী প্রস্তাব পাস করাতে ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। পার্টি সভাপতি মওলানা ভাসানীসহ নির্বাহী কমিটির নয়জন সদস্য পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারীগণ ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় এক মহাসম্মেলন আয়োজন করে। সেখানে আওয়ামী লীগভূক্ত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, লুণ্ঠ হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রীদলের সদস্যরা এবং এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক কমিউনিস্ট নেতৃ যোগ দেন। এই সম্মেলনে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) নামক একটি নতুন পার্টির জন্ম হয়। মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় ন্যাপ এবং পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। নবগঠিত ন্যাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

১. পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিকতা, সত্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিত করণ;
২. জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন;
৩. নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশের স্বায়ত্ত্বাসন কার্যম করার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক্যবদ্ধ করা...

ন্যাপ গঠিত হলে বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী এই দলে যোগদান করেন। ফলে এই দলের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। পরবর্তী এক দশকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা ন্যাপের নেতৃত্ব পদে আসীন হন। ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন করতেও সক্ষম হয়। ন্যাপ তার অঙ্গ সংগঠনক্কে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি গঠন করে (ডিসেম্বর, ১৯৫৭)। আবদুল হক এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট ও ন্যাপ নেতাদের উদ্যোগে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন (১৯৫৮, ফেব্রুয়ারি)। মোহাম্মদ তোয়াহা এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের বিভিন্ন করণ

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। মওলানা ভাসানী গ্রেফতার হন। অনেকের নামে ছলিয়া জারি করা হয়। যে সকল কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী ধরা পড়েননি তারা আভারগ্রাউন্ডে চলে যান। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকে। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নেয়া হলে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে বিভেদ ঘটে যায়, যার প্রভাব এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলি, ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তানের চীনকে সমর্থন দেয়ার নীতি কমিউনিস্টদেরকে চীনাপন্থী ও সোভিয়েতপন্থী দুই ধারায় বিভক্ত করে। এর প্রভাব পড়ে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। এই

নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি মিস ফাতিমা জিমাহকে সমর্থন করলে তৎসময় এতৎ তার দল (আইয়ুব খানের সরকার চীনা সরকারের মিত্র হওয়ায়) নির্বাচনে ফাতিমা জিমাহকে সমর্থন দেয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের মধ্যে সৃষ্টি মতান্দর্শ বিরোধ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নকে প্রভাবান্বিত করে। এসময় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রানো প্রমুখ নেতৃবর্গ কমিউনিস্ট পার্টির চীনাপছী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখের লাইন অনুসরণ করেন। অবশেষে ১৯৬৫ সালের ১ থেকে ৩ এপ্রিল ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনসিটিউটে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়। সম্মেলন শেষে সোভিয়েতপছীদের গ্রুপ মতিয়া চৌধুরী ও সাইফুল্দিন মানিক এবং চীনাপছীরা রাশেদ খান মেনন ও সফিকুর রহমানকে যথাক্রমে দুই গ্রুপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। এইভাবে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নামে অভিহিত হয়। মতিয়া গ্রুপ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মেনন গ্রুপ চীনের সমর্থকে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দেয় এবং সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে সমর্থন দেয়। তখন থেকে এদেশে চীনাপছী ও সোভিয়েতপছীদের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

ছাত্র ইউনিয়নের বিভক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনাপছী ও সোভিয়েটপছী এই দুই অংশ বিভক্ত হয়। চীনাপছীরা তোয়াহা ও সুবেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে গঠন করে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ-লেলিনবাদ) এইভাবে চীনাপছীরা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হয়ে গেলে মূল কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নিষিঙ্ক ঘোষিত থাকা সম্মত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তার অন্তিম কেবল ধরে রাখতে সম্মত হয়নি, বরং সারাদেশ জুড়ে শাখা বিস্তার করে পার্টিকে শক্তিশালী করতে পেরেছিল। চীনাপছীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; এবং উক্ত অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বাবিশিষ্ট স্বাধীন পার্টিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবে এই পার্টি মঙ্গোপছী কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে।

ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির মতো ন্যাপেও ভাঙনের ধারা লাগে। সেখানেও নেতৃবর্গ সোভিয়েতপছী ও চীনাপছীতে বিভক্ত হয়। ১৯৬৭ সালে ন্যাপের রংপুর কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানীর নেতৃত্বে চীনাপছী ন্যাপ নেতা-কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থাকলে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে সোভিয়েতপছীরা অনুপস্থিত থাকে এবং তারা ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পৃথক অধিবেশন আয়োজন করে। এইভাবে দুই পৃথক সম্মেলনে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হয়। এরপর থেকে চীনাপছী ন্যাপ পরিচিতি লাভ করে ভাসানী ন্যাপ নামে এবং সোভিয়েত পছীরা (মঙ্গোপছী) মোজাফফর ন্যাপ নামে। বিভক্তির মাধ্যমে ন্যাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। ন্যাপ বিভক্ত হয়ে গেলে এর কিছু সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে যান এবং কিছু সদস্য আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

১৯৬৬ সালের পর থেকে কমিউনিস্টদের একটি অংশের মধ্যে অতিবিপুরী ঝৌক প্রবল আকার ধারণ করে। বিপুরের রণকোশল নির্ধারণের প্রশ্নে চীনাপছীরা ক্রমান্বয়ে

বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়। ১৯৬৮ সালের একটি সমস্তজাতীয় প্রাদেশিক আন্দোলন হোসেন, নূরুল হাসান, মাহবুবউল্লাহ, আবুল কাশেম ফজলুল হক মিলে গঠন করেন পূর্ববাংলার বিপ্রবী কমিউনিস্ট আন্দোলন। দেবেন শিকদার ও আবুল বাশার এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পাবনার জয়নগরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' (মা.লে.) গঠন করেন। তবে অল্প কিছুদিন পর এই দুই সংগঠন একত্রীভূত হয়। ১৯৬৯ সালে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রলো, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ ছাত্রনেতা ছাত্রজীবন শেষ করে 'কমিউনিস্ট বিপ্রবীদের পূর্ববাংলা সমস্য কমিটি' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এদের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ শ্রমিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন এবং টঙ্গী শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সিরাজ শিকদার 'মাও গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে চীনাপছ্টী কমিউনিস্টদের সংঘবন্ধ করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই এই কেন্দ্র বিলুপ্ত করে ৮ জানুয়ারি (১৯৬৮) পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্রব পরিচালনার ডাক দেয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৬০-এর দশকে বামপছ্টী দলগুলি নানান উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্তি ঘটে চীনাপছ্টী দলগুলোর মধ্যে বেশি।

(৯) কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি)

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ডরাডুবির পর এ.কে. ফজলুল হক রাজনীতি থেকে নির্জিয় হন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের ২৩ আগস্ট তিনি তার পার্টি কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনর্জন্ম দেন এবং পার্টির নামকরণ করেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় পার্টির নামে 'প্রজা' শব্দটি পরিবর্তন করে 'শ্রমিক' শব্দ যুক্ত করা হয়। এ.কে. ফজলুল হক এর সভাপতি নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগ থেকে অনেক হতাশাগ্রস্ত সুবিধাবন্ধিত নেতা ও কর্মী কে.এস.পি.তে যোগদান করে। যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য মুসলিম লীগার ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবু হোসেন সরকার, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তাতে যোগ দেন মুসলিম লীগের তরঙ্গ কর্মীরা, যারা অধিকাংশ ছিলেন নিম্নবিভিন্ন ও মধ্যবিভিন্ন শ্রেণীর। কে.এস.পি.তে মূলত যোগ দেন মুসলিম লীগের সিনিয়র সদস্যরা, যারা অধিকাংশই ছিলেন প্রবীণ এবং সমাজের উচ্চবিভিন্ন শ্রেণীর। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটি গঠিত হয়। দল গঠনের পর পরই আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং নেজামে এছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফুন্ট গঠিত হয়। যুক্তফুন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মওলানা ভাসানী কিংবা সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী না-হওয়ায় এ.কে. ফজলুল হক যুক্তফুন্ট পার্লামেন্টারি পার্টি নেতা নির্বাচিত হন। এরপর তার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া, তার দলের কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন, যুক্তফুন্টের ভাঙ্গন, পূর্ববাংলায় কে.এস.পি.র সরকার গঠন- ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল এইটুকু মন্তব্য

করা যায় যে, ১৯৫৮ সালের পর এই দলটি কেবল আমন্ত্রণ করতে পারে, এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে।

(১০) পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববাংলা কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা তাদের পার্টিকে ‘পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ নামে পুনর্গঠিত করেন। ইসলামী দেশ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য। সে-সময় তফশিলি সম্প্রদায়ের অনেক হিন্দু কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তানের মতো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কংগ্রেসের রাজনীতি সহজ ছিল না। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাম্প্রদায়িক আচরণ, প্রাদেশিক পরিষদ ও গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদেরকে পাকিস্তানের শক্ত এবং ভারতীয় অনুচর হিসেবে গালমন্দ করা, পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিরূপ সমালোচনা ইত্যাদি কারণে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কিরণ শঙ্কর রায় খুব শীত্র দৈর্ঘ্য হারিয়ে ফেলেন এবং দেশভাগের আট মাসের মাথায় তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তখন শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের হাল ধরেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক আসন নির্দিষ্ট আসন নির্দিষ্ট থাকায় আইন পরিষদে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিল। স্বতাবতই পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের ভোটে গঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে হিন্দু-প্রতিনিধিও ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দু-সদস্যরাই পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। তখন সকল মুসলমান-সদস্য হিলেন মুসলিম লীগ দলের। বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবি গণপরিষদে উত্থাপন করেছিলেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু যেহেতু একজন হিন্দু সদস্য বাংলাভাষার প্রশংসন উত্থাপন করেছেন অতএব এর পিছনে ভারতের চক্রান্ত আছে বলে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন। স্বতাবতই কোনো হিন্দু সদস্যের পক্ষে এখানে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তথাপি ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করায় ৭২ জন হিন্দু-প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদেও এরা আসন পায়। ১৯৫৪-৫৮ সময়কালে পূর্ববাংলার ‘সরকার ভাঙা-গড়া’ খেলায় হিন্দু-প্রতিনিধিরা ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণ করা হলে অনেক হিন্দু রাজনীতিবিদগণ এই দলে যোগদান করেন। ফলে কংগ্রেস দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সামরিক আইন প্রত্যাহত হলে অনেক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও পাকিস্তান কংগ্রেসের কার্যক্রম বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

(১১) খিলাফতে রক্বানী পার্টি

১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মতান্তরে ২০ এপ্রিল এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। শোষণহীন ইসলামী সমাজ জীবন কায়েম করা এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যর্থ এবং যে-উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি সেই দারুণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা যেহেতু মুসলিম লীগকে দিয়ে সম্ভব নয় তাই খিলাফতে রক্বানী পার্টির প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে এই পার্টির আহ্বায়ক ও তমুচ্ছন মজলিশের প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সোলায়মান খান বলেন।

(১২) নেজামে এছলামী

কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১ আগস্ট এই পার্টি গঠিত হয়। মওলানা হাফেজ আতাহার আলী এই দলের সভাপতি নিযুক্ত হন। যদিও মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত উলামাবৃন্দ এই দলের সদস্য হন, কিন্তু ফরিদ আহমদ এবং সৈয়দ কামরুল আহসানের মতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিগুলি এই দলে যোগ দেন। মূলত উচ্চবিত্ত মুসলমানেরা এই দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী গঠিত জোট যুজ্ফুন্টের শরিকদল ছিল নেজামে এছলামী। সামরিক আইন প্রত্যাহত হওয়ার পর এই দল পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করতে পারেনি।

(১৩) জামায়াতে ইসলাম

ব্রিটিশ আমলেই এই দলের জন্ম। যদিও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এই দল পাকিস্তানকে দলীয় আদর্শ বাস্তবায়নের উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। দেশ ভাগের প্রথম দিকে জামায়াতে ইসলামী সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এইভাবে একটা সমর্থক গোষ্ঠী শুরু হলে জামায়াত রাজনৈতিক কর্মসূচি হাতে নেয়। পাকিস্তানের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে এই দল প্রথম সফলতা অর্জন করে ১৯৫৮ সালের করাচী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচনের এক উজ্জনেরও বেশি আসন লাভের মাধ্যমে। এই দল একটি আদর্শভিত্তিক দল হওয়ায় এবং দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে হত বিধায় দলটি আপামর জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিতে যেমন যে-কেউ যখন খুশি তখন দলের সদস্যপদ লাভ করতে পারে, জামায়াতে ইসলামের সদস্যপদ লাভ তেমন সহজসাধ্য ছিল না। এই দলের সদস্যপদ লাভ করতে হলে দলের নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করতে হতো। ফলে দলের সদস্য সংখ্যা বাঢ়েনি। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে এই দলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৭১ জন। দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জামায়াতে ইসলামী দলের সদস্যদেরকে নিয়মিত চাঁদা, জাকাত, কোরবানির পশুর চামড়া, অনুদান প্রভৃতি দিতে হত। স্বাধীনতার পর থেকে মওলানা মওদুদী এই দল পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি প্রচুর ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন যা প্রায় ক্ষেত্রে

বিতর্কিত। জামায়াতের যে দর্শন তার দিক নিদেশক মওলানা মওদুদী তৎকালীন পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তানেও এর শাখা গঠিত হয়।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের জন্ম

যাহোক, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলায় তিনটি ছাত্র-সংগঠন ছিল : ১. কম্যুনিস্ট পক্ষী All Bengal Student Federation. ২. কংগ্রেসপক্ষী All Bengal Student Congress. ৩. মুসলিম লীগ পক্ষী All Bengal Muslim Student League. বাংলা বিভক্তির পর পূর্ববাংলাতে উপরিউক্ত প্রতিটি সংগঠনের শাখা গঠিত হয়।

ABMSL-এ দুই গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে হাশিম-সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা ছিল উদারনৈতিক, অন্যপক্ষে নাজিমউদ্দীন-আকরাম খা'র অনুসারীগণ ছিল রক্ষণশীল। বাংলা বিভক্তি প্রশ্নে বাংলা মুসলিম লীগে হাশিম-সোহরাওয়ার্দীরা বাংলা বিভক্তির বিরোধিতা করেন এবং ফলশ্রুতিতে তারা ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পরেও কলকাতায় থেকে যান। কিন্তু তাদের অনুসারী অনেক ছাত্রনেতা ও কর্মীবৃন্দ পূর্ববাংলায় চলে আসে। স্বাধীন পূর্ববাংলায় নাজিমউদ্দীনের মুখ্যমন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শাহ আজিজ-শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ রক্ষণশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। অন্যপক্ষে হাশিম গংদের অনুসারী ছাত্রবৃন্দ সরকারের বিরোধীপক্ষ অবলম্বন করে। ফলে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ববাংলা মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ' দ্বিবিভক্ত হয় এবং নঙ্গেমুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে East Pakistan Muslim Student League গঠিত হয়। সরকার সমর্থিত অংশের নামকরণ হয় All East Pakistan Muslim Student League.

১৯৪৮থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে যেখানে EPMSL অগ্রণী ভূমিকা রাখে সেখানে AEPMSL সরকারের গুণাবাহিনীতে পরিণত হয়।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে East Pakistan Awami Muslim League গঠিত হলে EPMSL আওয়ামী-মুসলিম লীগের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হয় এবং AEPMSL মুসলিম লীগের এক কাণ্ডে ছাত্র-সংগঠনে পরিণত হয়। এই অংশের নেতা ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান।

(১) পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (পরে ছাত্রলীগ)

৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন নঙ্গেমুদ্দিন আহমদ (রাজশাহী)। ছাত্রলীগের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন :

১. আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল); ২. শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর); ৩. অলি আহমদ (কুমিল্লা); ৪. আজিজ আহমদ (নোয়াখালী); ৫. আবদুল মতিন (পাবনা), ৬. দবিরুল ইসলাম (দিনাজপুর), ৭. মফিজুর রহমান (রংপুর); ৮. শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা); ৯. নওয়াব আলী (ঢাকা); ১০. নূরুল কবির (ঢাকা সিটি); ১১. আবদুল আজিজ (কুষ্টিয়া); ১২. সৈয়দ নূরুল আলম (ময়মনসিংহ); ১৩. আবদুল কুদ্দুস

চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করে :

ছাত্রলীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

১. ক. পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা;
খ. বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা।
 ২. পাকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তিকে কবলমুক্ত করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
 ৩. ক. স্বার্থসূচী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজকে তাহাদের স্বার্থসূচির যত্নপে চালিত হইতে না দেওয়া;
খ. ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা।
 ৪. ক. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা;
খ. ছাত্রসমাজকে পরম্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রীভূত করা;
গ. ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা;
 - ঘ. ছাত্রসমাজকে কৃষি ও আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংশ্পর্শে অনিয়া নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি করা;
 - ঙ. জাতি ও দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজের বিক্ষিণ কর্মসূচিকে সুসংবচ্ছ কেন্দ্রীভূত করা।
 ৫. ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করতঃ জাতীয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা আনয়ন করা।
 ৬. পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রস্তুত করা।
 ৭. জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলোর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনকে সুদৃঢ় করা।
 ৮. সরকারের জনকল্যাণকর কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করা এবং গণস্বার্থবিরোধী কর্মপদ্ধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।
 ৯. প্রাণব্যক্তিদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি।
 ১০. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মূলাফাকারী ও চোরাকারবারীদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার ধ্বংস সাধন।
- ছাত্রলীগের দাবি**
১. আজাদী লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন।
 ২. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ও বর্তমান শিক্ষা সংকোচ নীতির প্রতিরোধ।
 ৩. ক. বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন;

৬. পূর্ব পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, হল প্রতি সামরিক পদানের জন্য অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- গ. পাকিস্তান নৌবিভাগের সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিতকরণ।
৮. কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি প্রসারের অধিকতর সুবিন্দোবন্তকরণ।
৯. ক. স্বল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা;
- খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকতর সরকারি সাহায্য;
- গ. শিক্ষায়তনগুলোতে উপযুক্ত বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ;
- ঘ. পল্লী অঞ্চলকে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মফস্বল শিক্ষায়তনগুলোর জন্য অধিকতর ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা;
- ঙ. গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলোতে অধিকতর ফ্রি স্টুডেন্টশিপ এবং বৃক্ষির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা;
- চ. শিক্ষায়তনসমূহের পাঠাগারগুলিতে ইসলামিক কৃষি ও ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থের সমাবেশ;
- ছ. বিনাব্যয়ে ছাত্রদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা।
৬. নারীশিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা।
৭. পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজসমূহে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণের আও ব্যবস্থা।
৮. শিক্ষায়তনগুলোকে স্বায়ত্ত্বাসনমূলক ক্ষমতা প্রদান।
৯. শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলোতে স্বায়ত্ত্বাসনমূলক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার।
১০. শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া দিয়া শিক্ষায়তনগুলোর পরিপ্রতা রক্ষা করা।”

সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪৭-৪৮।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে 'মুসলিম' শব্দ থাকায় হিন্দু-সদস্যদের ঐ দলে যোগদান সম্ভব হয়নি। ১৯৪৯ সালে ছাত্রলীগকে অসামপ্রদায়িকীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী তা কাউন্সিলারগণের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কোনো কাউন্সিল অধিবেশন না-হওয়ায় ছাত্রলীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া বিলম্বিত হয়। ১৯৫৩ সালে কাউন্সিল অধিবেশনের পর থেকে ছাত্রলীগ অসামপ্রদায়িক ছাত্র-সংগঠনে পরিণত হয়। কালক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগ একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। পাকিস্তান আমলে অন্যান্য ছাত্র-সংগঠনে ভাঙ্গ ধরলেও ছাত্রলীগের এক্য অটুট থাকে। এই সংগঠনটি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৪৮-৫২ সময়ের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে: ১৯৬০, ৬২ ও ৬৪-এর আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে, ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলনে এবং ৬৯-এর গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এর সংগ্রামী ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল। অলি আহমদ ছাত্রলীগের কৃতিত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন।

ছাত্রমহলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে উদ্ধৃত করে। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন সম্মিলিতে ছাত্রলীগ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়াছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক দাবিদার এই ছাত্র-সংগঠন। ভাবীকালে এই সংগঠন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর রূপায়ণ ও পরিবর্তনে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ছাত্র ফেডারেশন

দেশভাগের পর পূর্ববাংলা ছাত্র ফেডারেশনের যে শাখা গঠিত হয় তা গোড়াতেই বেশ দুর্বল ছিল। এই সংগঠনটি কম্যুনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন ছিল। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল হিন্দু। দেশভাগের পর হিন্দু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা ব্যাপক হারে ভারতে গমন করায় কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন উভয় সংগঠন এখানে দুর্বল এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারের দমননীতির কারণেও ছাত্র ফেডারেশন এখানে স্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে এই দলের অনেক নেতা-কর্মীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এই সংগঠনটির জন্ম। রাজনীতি সচেতন বামপন্থী ছাত্ররা যেহেতু ছাত্র ফেডারেশনের নামে রাজনীতি করতে সরকারি বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম-হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছিল এবং যেহেতু ধর্মীয় কারণে মুসলিম ছাত্রলীগেও (১৯৫৩ পর্যন্ত) যোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না; তাই একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী ছাত্র-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। জাতীয়ভিত্তিক এই ছাত্র-সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ছাত্র-ইউনিয়ন নামে সংগঠন বিভিন্ন মফস্বল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ড. আবুল কাশেম তাঁর গবেষণা প্রবক্ষে উল্লেখ করেছেন। ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে ড. আবুল কাশেম ছাত্র ইউনিয়নের একজন প্রাচুর্য সাধারণ সম্পাদকের নিম্নলিখিত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় ছাত্রআন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখে যেসব নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তা আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ১৯৫২ সালে এপ্রিল মাসে ঢাকায় একটি প্রাদেশিক সম্মেলন বসেছিল। ঐ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে একটা নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে মত দেয়। এই ছিল '৫২-এর এপ্রিল সম্মেলনে ছাত্র-প্রতিনিধিদের বক্তব্য। ছাত্র প্রতিনিধিদের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঐ সম্মেলন ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য। ছাত্র প্রতিনিধিদের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঐ সম্মেলনে যে নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তার নাম দেয়া হয় পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। একই সালের নভেম্বর মাসের সম্মেলনে যখন এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয় তখন ছাত্র-সংগঠনটিকে একটি প্রাদেশিক সংগঠনে পরিণত করা হয়, নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

১৯৫৪ সালের যুজ্বলন্ট গঠনে এবং পরবর্তাকালে সামাজিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠিত হলে ছাত্র ইউনিয়ন ন্যাপ-এর অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৬৭ সালে ছাত্র ইউনিয়ন আদর্শিক সংঘাতের কারণে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়। এক গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ এবং অন্যটি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়।

(৪) ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এন.এস.এফ)

১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এন.এস.এফ গঠন করেন। দলটি শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠীর লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করে এবং আইয়ুবের পতন পর্যন্ত তা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার অনুগত সংগঠন হিসেবে কাজ করে।

(৫) ছাত্র এসোসিয়েশন

দেশভাগের পর পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন নামে একটি ছাত্র-সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দলের এই নামকরণ করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে এই দলের বিকাশ সম্ভবপর হয়নি।

(৬) পাকিস্তান ছাত্র সংघ (স্টুডেন্ট র্যালি)

অসামপ্রদায়িক অর্থচ কমিউনিস্ট বিরোধী এমন ছাত্ররা এই দল গঠন করে। রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে ছাত্র-সংগঠন করাই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই দলটিও স্থায়ী হয়নি।

(৭) ছাত্রী সংঘ

মূলত কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইডেন ও কামরঞ্জেছা বালিকা বিদ্যালয়ের একত্রীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্রীবিক্ষোভ ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে এই সংগঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে প্রকাশ্যে ইসলামী পাকিস্তানের রাজপথে ছাত্রীদের নিয়ে মিছিল করায় সেদিন এই সংগঠন তৎকালীন সরকার ও সমাজপতিদের তীব্র কটাক্ষের সম্মুখীন হয়। নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও নানা প্রতিকূলতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই সংগঠন তার স্থায়িত্ব সম্ভৱত রাখতে পারেনি।

বিভিন্ন জোট গঠন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবিত থাকাকালীন আওয়ামী লীগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬২ সালের সংবিধান ঘোষণার আগেই তাকে জননিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়েছিল। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি ঢাকা আসেন এবং তার মুক্তি উপলক্ষে ঢাকায় এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সরকারপন্থী 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে উক্ত জনসভায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। উক্ত সমাবেশে সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে, বিরাজমান পরিষ্কৃতিতে তিনি আওয়ামী লীগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী, তবে দেশে গণতন্ত্র পুনরুজ্বারের উদ্দেশ্যে সকল দলের সমন্বয়ে তিনি একটি মুক্ত গঠনের আহ্বান জানান।

তার এই আহ্বানে ভালো সাড়া পাওয়া যায়। আন্দোলন কাউন্সিল জনপ্রিয়তা ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক-শ্রমিকপার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ মিলে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে অক্টোবর (১৯৬২) 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' এনডিএফ নামে সুপরিচিত। নামে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংবিধানের গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল এনডিএফ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এনডিএফ গঠনকারীরা ঘোষণা করেন যে, তারা কেউ আইয়ুব সরকারের অধীন কোনো পদ গ্রহণ করবেন না।

এনডিএফ-কে এর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল না বলে একে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করে। খুব শীঘ্র এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'রাজনৈতিক দল আইনের' আওতায় এবড়োর আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের রাজনীতি করার অধিকার ছিল না। কিন্তু এনডিএফ-কে রাজনৈতিক দল হিসেবে অভিহিত না করা অনেক এবড়োর রাজনীতিবিদ এনডিএফ-এর আন্দোলনে জড়িয়ে যান। বিষয়টি সরকারকে বিব্রত করে। ফলে আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দল আইন' সংশোধন করে ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি ২টি অধ্যাদেশ জারি করেন। প্রথম অধ্যাদেশে 'রাজনৈতিক দল' কথাটির পুনঃব্যাখ্যা করা হয় এবং বলা হয় যে একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রুপ কিংবা কিছু ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে লিঙ্গ হলে এত রাজনৈতিক দলীয় কার্যক্রমের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে। এই অধ্যাদেশ বলে সরকার আরও একটি ক্ষমতা লাভ করে। তাহলো এবড়োর অধীনে সাজাপ্রাণ কোনো ব্যক্তিকে সরকার ছয় মাসের জন্য যে-কোনো ধরনের প্রেস কনফারেন্স করা ও বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবেন। দ্বিতীয় অর্ডিন্যাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট যে-কোনো এবড়ো-সাজাপ্রাণ ব্যক্তিকে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর থেকে অযোগ্যতার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারতেন। উপরিউক্ত অধ্যাদেশসময় একদিকে যেমন যে-কোনো রাজনৈতিক নেতাকে এনডিএফ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারত, অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের দলের সদস্য হতে ইচ্ছুক এমন এবড়ো-সাজাপ্রাণ ব্যক্তির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করা যেত।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইস্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। নবাবজাদা খাজা নসরুল্লাহ খান এর প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ইতিপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ আগস্ট ১৯৬৩ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আত্মপ্রকাশ করেছিল। আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ এনডিএফ-এর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার কর্মসূচীতে অব্যাহত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এনডিএফ-এর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীন এতে যোগ দেন। সম্মেলন শেষে নূরুল আমিনকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সমস্ত মতাদর্শগত

বিভিন্নতার উর্দ্ধে উঠে এক মধ্যে কাজ করার দৃঢ় প্রস্তাৱ দ্বাৰা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহ বিভিন্ন বিরোধীদলকে আইযুববিরোধী মধ্যে সমবেত হওয়ার পূর্বে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফুন্ড গঠনের একটি প্রস্তাৱ সমৰ্থন করে এবং 'সম্মিলিত বিরোধীদল' (Combined Opposition Party বা COP) নামে একটি জোট গঠন করে। এই জোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল বিরোধীদলের পক্ষে মিস ফাতিমা জিলাহকে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং নয় দফা নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। দফণগুলি ছিল:

১. একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন;
২. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা;
৩. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আইন ও বাজেট প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান;
৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের বিধান;
৫. প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসকরণ;
৬. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ;
৭. আইনের সাংবিধানিক বৈধতা যাচাইয়ের ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টকে প্রদান;
৮. সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি;
৯. নির্বর্তনমূলক সকল আইনের বিলুপ্তি।

'কপ'-এর পক্ষ থেকে লে. জেনারেল মোহাম্মদ আজম খানকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার ইচ্ছে থাকলেও ন্যাপের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে, 'মার্শাল-ল' জারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার তিনি ও তার দল বিরোধী। আজম খান মার্শাল-ল' জারির সঙ্গে ও মার্শাল ল' প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তিনি পূর্ববঙ্গে ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাই আইযুবের বিরক্তকে তিনি একজন ভালো প্রার্থী হতে পারতেন। কিন্তু ন্যাপ-এর বিরোধিতায় তাঁকে প্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। ফলে মিস ফাতিমা জিলাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করা হয়। এমনকি একজন মহিলাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য প্রার্থী মনোয়ন করা শরিয়ত বিরোধী নয় এই মর্মে জামায়াতে ইসলামীর আমির মওলানা মওদুদী পার্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে নেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পাকিস্তান ছাত্রশক্তি নামক তিনটি ছাত্র সংগঠন মিলে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্রসমাজ' নামক ছাত্র ঐক্যজোট গঠন করা হয়। এই জোটের পক্ষ থেকে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব, মৌলিক গণতন্ত্রী এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন, ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদ ব্যাখ্যা করা হয় এবং শেষে সাত দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সংগ্রামী ছাত্রসমাজের কর্মসূচীগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. সকল ইউনিয়ন এবং সম্ভব হইলে ইউনিটে 'ফাতিমা জিলাহ নির্বাচনী কমিটি'

গঠন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক ও ছান্সের প্রতিষ্ঠানের নিয়ে সমিলিতভাবে ইহা গঠন করা।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি.ডি.এম) গঠন

আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের ফলে সরকার ভীতসন্ত্বষ্ট হয়ে পড়ে এবং এই আন্দোলনকে অঙ্গুরেই বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে ছয়দফার আন্দোলন কিছুটা ভাটা পড়ে। এমনি অবস্থায় আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালের ২ মে ঢাকায় আতাউর রহমানের (যিনি একসময় আওয়ামী লীগে নেতা ছিলেন এবং পরে এনডিএফ-এর সঙ্গে যুক্ত হন) বাসায় মিলিত হন এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি.ডি.এম) নামক ঐক্যজোট গঠন করেন। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে এছলামী, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, এন.ডি.এফ. এবং জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা বন্দি থাকায় এবং ছয়দফা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থিমিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় পি.ডি.এম. সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। পি.ডি.এম. এ যোগদান করা হবে কি-না এই প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙ্গন ধরনোর চেষ্টা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ কারাগারে বন্দি থাকার সুযোগে আওয়ামী লীগের কিছু রক্ষণশীল নেতা- যেমন আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ- পি.ডি.এম এ যোগদানের পক্ষপাতা ছিলেন। কিন্তু এই দলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ভারপ্রাণ সাধারণ সম্পাদক যথাত্মে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমেনা বেগম পি.ডি.এম. এ যোগদানে বিরোধিতা করেন। ফলে আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয় এক অংশে থাকে ছয়দফা-গাঁথীরা, অন্য অংশে পি.ডি.এম.-গাঁথীরা। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সামান্য কয়েকজন রক্ষণশীল নেতা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে পি.ডি.এম-এ যোগ দেন। পি.ডি.এম. আট দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত দফাগুলি ছিল নিম্নরূপ-

পি.ডি.এম.এর আট দফা

এক. শাসনতন্ত্রে নিম্নবিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবে :

- (ক) পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার;
- (খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাণবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য;
- (গ) পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার;
- (ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আয়াদী ও
- (ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

দুই. ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন:

- (ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স);
- (খ) বৈদেশিক বিষয়;

(গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা;

(ঘ) আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐক্যমত নির্ধারিত অন্য যে-কোনো বিষয়।

তিন. পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়স্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় স্ফুরণ শাসনতত্ত্ব মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যান্ত থাকিবে।

চার. উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঝণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা নিরঙ্কুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে;

(খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে;

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না-হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও খনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবেন যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বক্ষ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

পাঁচ. (ক) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং;

(খ) আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য;

(গ) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ;

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক-একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন।

ছয়. সুপ্রিমকোর্ট এবং কৃটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়স্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

সাত. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতাত্ত্বিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ

ও স্কুল স্থাপন করিতে হইবে;

(খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে;

(গ) নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

আট. এই ঘোষণায় ‘শাসনতত্ত্ব’ শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতত্ত্ব বুর্জায়-যাহা অবিলম্বে জারি করা হইবে। এই শাসনতত্ত্ব চালু করিবার ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচীর দুই হইতে সাত নম্বর দফাসমূহকে শাসনতত্ত্বে সম্মিলিত করা হইবে।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির সঙ্গে পি.ডি.এম.-এর আট দফা দাবির তুলনা :
 পি.ডি.এম.-এর আট দফা দাবি আওয়ামী লীগের ছয়দফার বর্ধিত সংক্রমণ।
 পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কত বছরে দূর করা হবে— ছয়দফায় এর কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু আট দফায় বলা হয়েছিল যে, দশ বছরের মধ্যে ঐ বৈষম্যসমূহ দূর করতে হবে। আট দফায় সামরিক বাহিনীর বৈষম্যও দূর করার দাবি উত্থাপন করা হয় বা ছয় দফায় করা হয়নি। পি.ডি.এম.-এর গঠন-কাঠামো ও এর গৃহীত কর্মসূচী ইতিপূর্বে গঠিত কপ কিংবা এন.ডি.এফ. থেকে ডিস্ট্রিবিউট ছিল।
 পি.ডি.এম. আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে বন্ধপরিকর ছিল। পি.ডি.এম.-এ অনেক পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ছিলেন, ফলে এই জোট একটি জাতীয় বিরোধীদলের জোট রূপ লাভ করে। আওয়ামী লীগের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি একটি আঞ্চলিক দলের জোট কিন্তু পি.ডি.এম.-এর স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়।
 ফলে আওয়ামী লীগের ছয় দফায় বর্ণিত স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে ১৯৬৭ সালের ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন এবং ভাসানী ন্যাপ কর্তৃক আইয়ুব সমর্থন দান ছয় দফা আন্দোলনকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলে। এসময় পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো ‘পাকিস্তান পিপলস পার্টি’ গঠন করেন এবং ভাসানী ন্যাপের সাথে রাজনৈতিক এক্য স্থাপন করেন।

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ভাক) গঠন

পাকিস্তান সরকার যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেছিলেন ঠিক এসই সময়েই পি.ডি.এম.-ভুক্ত পাঁচটি দল ও অপর তিনটি দল মিলে ‘ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি’ সংক্ষেপে ‘ভাক’ (DAC) নামক একটি বিরোধী জোট গঠন করেন। এই জোট ছিল এন.ডি.এফ., পি.ডি.এম. ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে এছলামী দলসমূহ। ভাসানী ন্যাপ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি এই জোটে যোগদান করেনি। ‘ভাক’ (DAC)-এর অন্যতম নেতৃবৃন্দ ছিলেন এন.ডি.এফ.-এর হামিদুল হক চৌধুরী নূরুল আমিন, মাহমুদ আলী, নেজামে এছলামীর ফরিদ আহমেদ, পীর মোহসীনউদ্দিন (দুদু

মিয়া), পি.ডি.এম.-পছ্টী আওয়ামী লীগের আবদ্দস সালাম খন ছয় দফা পছ্টী আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আয়ম, ন্যাপ (ওয়ালী)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এবং স্বতন্ত্র বিচারপতি এস.এম. রাশেদ। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খান এর আহবায়ক মনোনীত হন। 'ডাক' জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করে এবং সে লক্ষে ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। উক্ত ৮ দফা ছিল নিম্নরূপ :

১. ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা কায়েম;
২. প্রাণবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন;
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার;
৪. পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষকরে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনেশ্যাস বাতিল;
৫. খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দি, রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার;
৬. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার;
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার;
৮. নতুন ডিক্রারেশন দানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ সহ সংবাদপত্রের উপর জারিকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইস্টেফাক, চাতন, প্রগেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়ান্ত্রিক কিংবা ডিক্রারেশন বাতিলকৃত প্রেস পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন।'

'ডাক'-এর এই কর্মসূচির দলিলে স্বাক্ষরদাতাগণ তাদের নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে এই প্রতিজ্ঞ করেন যে তারা এবং তাদের পার্টি জনগণকে তাদের পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত, অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

'ডাক'-এর গৃহীত ৮ দফা কর্মসূচির প্রথম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বামপছ্টী ও ডানপছ্টীদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় এই জোটের পক্ষে আওয়ামী লীগের ছয় দফাকেও পুরোপুরি সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। কিংবা আমেরিকার সঙ্গে সামরিক জোট গঠনেও অস্বীকার করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় ডাকের পক্ষে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এক ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলেন যা পরে গণআন্দোলনের রূপ নেয়।

**ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন
বিস্তারিত সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য**

ভাষা আন্দোলন : পটভূমি ও ঘটনা প্রবাহ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমি দরকার-এই স্নেগানের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য হয়। স্বভাবতই ধর্মই ছিল পাকিস্তান জাতীয়তার ভিত্তি। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৯৭% এবং পূর্ববাংলার ৮০% ছিল মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম এক হলেও তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগণের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ :

বাংলা	ভাষার	জনসংখ্যা	-	৫৬.৪০
পাঞ্জাবি	"	"	-	২৮.৫৫
পুশ্তো	"	"	-	৩.৪৮
সিঙ্গি	"	"	-	৫.৪৭
উর্দু	"	"	-	৩.২৭
বেলুচি	"	"	-	১.২৯
ইংরেজি	"	"	-	০.০২
অন্যান্য	"	"	-	১.৫২
মোট			-	১০০.০০

বহু ভাষাভাষীর দেশ পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ়িটি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। তাদের একগুঁয়েমি ও অবিবেচক সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, আর এই ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা।

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা সচেতনতা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞানগর্জ যুক্তি দিয়ে বাংলামেঝে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন। ড. শহীদুল্লাহ ছাড়াও ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি বহু প্রার্থ্যাত ও স্বল্পখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর ফলে পূর্ববাংলার শিক্ষিত সমাজ এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সমক্ষে একটি প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বাংলাভাষার দাবিকে জোরদার করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নবগঠিত ২/১টি রাজনৈতিক সংগঠনও বাংলা ভাষার প্রশ়িটে বক্তব্য রাখে। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবলীগের' এক কর্মী সম্মেলনে ভাষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে প্রস্তাব করিতেছিয়ে, বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার

বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হচ্ছে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।

আর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়। এই সংগঠনটির নাম 'তমুদ্দন মজলিশ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর সংগঠনটি বিভিন্ন সাহিত্য-বৈঠক আয়োজন করে। এই সংগঠন ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃক্ষি করে। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি বই মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ভাষা বিতর্কের সূত্রপাত

যদিও পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% ভাগ লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দু তথাপি উর্দুকেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার এক চেষ্টা চলছিল। পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয় তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের কাছ থেকে তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ঘড়্যন্ত্রের গক খুঁজে পান। তাঁরা উক্ত প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখন্ততা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গণপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলাভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।

বিতর্কের পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মধ্যে গণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গণপরিষদে দেয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক নিয়মতাত্ত্বিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলাভাষার সমর্থনে স্নোগান দিতে দিতে রমনা এলাকায় মিছিল করে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে শেষ হলে সেখানে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করে তমুন্দিন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বঙ্গারা বলেন- পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব করেছেন তা কোনো সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়, বরং সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের দাবি এই যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে। পাকিস্তানের মুদ্রায় টিকিটে, মানি অর্ডার ফরমে কেবল উর্দ্বভাষা উল্লেখ থাকার কড়া সমালোচনা করা হয় এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাভাষা মুদ্রণ করারও জোর দাবি জানানো হয়।

বাংলাভাষার সংগ্রামকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্মি করে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকার ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা : তমুন্দিন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতাত্ত্বিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক, মুসলিম হলসহ অন্যান্য ছাত্রাবাস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্র ফেডারেশন কমিউনিস্ট দলের ছাত্র সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। উক্ত দিন ছাত্ররা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে সেক্রেটারিয়েটের বাইরে সমবেত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং ফলে কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। উক্ত সমবেশে ছাত্ররা প্রাদেশিক গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দীনের ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কড়া সমালোচনা করে এবং গণপরিষদ থেকে পূর্ববাংলার সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়।

এই প্রতিবাদসভাকে সরকার হিন্দু তথা পাকিস্তানের শক্রদের দ্বারা আয়োজিত এক গভীর চক্রাঞ্চ বলে প্রচার করে। সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলাভাষার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী ঘড়্যন্ত।

কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলন ১১ মার্চ বঙ্ক হয়ে যায়নি, বরং পরের দিনগুলিতে এই আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে এবং সাধারণ জনসাধারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছে যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। উক্ত আলোচনা সভায় ৮ দফা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলাভাষা প্রশ্নে যাহাদিগকে প্রেক্ষাতার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে ।
২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন ।
৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমর্মর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে ।
৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার ছলে সরকারি ভাষাকূপে স্বীকৃত হইবে । ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমেও হইবে বাংলা । তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে ।
৫. আন্দোলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না ।
৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে ।
৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে ।
৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশ্মনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই ।'

খাজা নাজিমউদ্দীন আলোচনা সভায় স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কোনো স্বদেশবিরোধী চক্রান্ত নয় । আন্দোলনকারীদের দাবি যথার্থ । তিনি উক্ত চুক্তিনামায় নিজ হাতে লেখেন যে, 'he was satisfied that the movement was not inspired by enemies of the state.'

ইতোমধ্যে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসে । উক্ত অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয় । ফলে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলন শুরু করে । চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নাজিমউদ্দীন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানার জন্য ছাত্ররা ১৭ মার্চ (১৯৪৮) প্রাদেশিক পরিষদের সভাকক্ষের দিকে মিছিল সহকারে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও বন্দুকের ফাঁকা গুলি করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয় ।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে নাজিমউদ্দীন ভীতসন্ত্বন্ত হয়ে পড়েন । তিনি গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিল্লাহকে যথাশীঘ্ৰ সম্ভব পূর্ববাংলা সফরে আসার আহ্বান জানান । সে অনুসারে গভর্নর জেনারেল প্রথম এবং শেষবারের মতো ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে আসেন । কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান । ২১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন

যে, তিনি কোনো শক্রকে, এমনকি সে যদি মুসলমান হয়, সত্ত্ব করবেন না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু-অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এই ঘোষণায় সভার কোনো-কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো, নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত সভার তিন দিন পর (২৪ মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন আসলে পাকিস্তানের শক্রদের কারসাজি। তিনি আন্দোলনকারীদের 'পঞ্চমবাহিনী'র পে অভিহিত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাঙালিরা তাদের প্রদেশের সরকারি ভাষার পে যে-কোনো ভাষা নির্বাচিত করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এ উক্তির তৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না না' ধ্বনি উচ্চারণ করে।

জিন্নাহর এই অবিবেচক, সৈরাচারী মনোভাব পূর্ববাংলায় বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হয়। ভাষার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধিদল জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিশুলি জানা যায়।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার ব্যাখ্যা

ইতিহাসের বিচারে এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে পাকিস্তানের মতো বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ঐক্যের বক্ষন সৃষ্টি করতে হলে যে কোনো একটি ভাষাকে Common Language হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, তৎকালীন পাক-শাসকগোষ্ঠী কেন উর্দুকে Common Language হিসেবে পাক-জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় এবং এর পিছনে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কী কারণ নিহিত ছিল? ভারতবর্ষে উর্দুর জন্ম মুঘল শাসনামলে মূলত সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ভাষা হিসেবে হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুর আবির্ভাব। উর্দু ভাষায় শব্দ বিন্যাসের ব্যাকরণগত পদ্ধতি নেয়া হয়েছে হিন্দি থেকে, আর শব্দ নেয়া হয়েছে আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে। উর্দু লেখা হত ফারসি বর্ণমালায়। যেহেতু মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর উদ্যোগে এই ভাষার জন্ম, তাই কালক্রমে উর্দু শাসকশ্রেণীর এবং মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়।

ব্রিটিশ আমলে সরকারিভাষা হিসেবে ফারসি পরিত্যক্ত হলে উর্দুর প্রচলন বেড়ে যায়। উচ্চস্তরের মুসলমানগণ উর্দুকে ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভারতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা হিন্দিকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তুতি নিলে মুসলিম লীগের মুসলমান নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনার অবতারণা করেছিলেন। এমনকি অনেক বাঙালি

মুসলিম লীগ রাজনীতিবিদ উর্দু পছন্দ করতেন। তাই সব দয়া যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরও বাংলালি মুসলমান রাজনীতিবিদগণ উর্দুকে বয়কটের কথা কখনো বলেননি। তারা বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করেন। পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% জনগণের মাতৃভাষা উর্দু হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য ভাষাভাষীরা উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দুর প্রচলন করা হয়।

তাছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের শাসনভার যে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে যায় তারা অধিকাংশই ছিলেন উন্নত ভারত থেকে আগত উর্দু ভাষাভাষী লোক। নতুন রাষ্ট্রের ব্যবসা, ব্যাংকিং, কয়েকটি পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ হয়। তারাও ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী। তাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। স্বভাবতই তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভাষার উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে তাদের দৃঢ় সংকল্প ছিল। কারণ উর্দু প্রশাসনিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা হলে উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য তা যতটা সহজ হবে, অন্য ভাষাভাষীদের জন্য তত সহজ হবে না। প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, যোগাযোগ প্রত্তি সকল বিভাগের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা এমনিতেই অনেক সুযোগসুবিধা ভোগ করছিল, তার উপর উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করায় সেখানকার অর্দুভাষীদের জন্য উর্দু কোনো সমস্যা ছিল না। ফলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা এটা মেনে নেয়, সেখানকার অর্দুভাষীরা এর কোনো প্রতিবাদই করেনি। প্রতিবাদ উচ্চারিত হল কেবল পূর্ববাংলায়।

অপরপক্ষে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী তথা পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ সদস্যগণ কর্তৃক বাংলার দাবি অগ্রহ্য করার পিছনে আশঙ্কা ছিল যে বাংলা তাদের মতে হিন্দুদের ভাষা এবং বাংলাকে স্বীকৃতি দিলে পূর্ববাংলার বাঙালিগণ পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের সঙ্গে যোগসাজ্জ করে ভবিষ্যতে বৃহৎ বাংলার দাবি করতে পারে। সেজন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলাভাষা আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী ও ইসলামবিরোধী চক্রান্ত বলে অভিহিত করে। বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে তারা বাংলাকে আরবি কিংবা রোমান অক্ষরে পরিবর্তিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুঃখজনক যে এই গর্হিত কাজের উদ্যোগ ছিলেন তৎকালীন (১৯৪৯) কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। তাঁর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা পুনর্গঠন কমিটি গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তানে এর কড়া প্রতিবাদ হয়। ফলে এই কমিটির রিপোর্ট ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনীয়তা

পূর্ববাংলা বাংলাভাষা আন্দোলনকারীদের বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পিছনে যুক্তি ছিল যথেষ্ট। বাংলা ছিল পাকিস্তানের ৫৬% লোকেরা মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি ভাষা শিক্ষা করা ও সেই ভাষায় চাকুরির প্রতিযোগিতায় ভালো করার সম্ভাবনা ছিল কম। পাকিস্তানের প্রশাসনে, সেনাবাহিনীতে ও অর্থনৈতিক সেক্টরে বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। তারপর যদি উর্দুকে সরকারি

ভাষা করা হয় তাহলে ভাষা সমস্যার কারণে বাঙালিদের কেন্দ্রীয় প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হত। ফলে সকল ক্ষেত্রে উর্দুভাষীরা অগ্রাধিকার পেয়ে আস্তে আস্তে বাঙালিদের গ্রাস করে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতো। যার অর্থ হচ্ছে বাঙালি সম্মান সমাধি। সুতরাং বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। তাদের এ প্রতিবাদ ক্রমান্বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ লাভ করে।

ভাষা-আন্দোলন : জিন্নাহর প্রত্যাবর্তনের পর

জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা-আন্দোলনকে স্থিমিত করে দেয়। জিন্নাহ অনেককে বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভাষা আন্দোলন ছিল কমিউনিস্টদের কারসাজি। দেশের সংহতি বিনষ্ট করাই উক্ত আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ শুন্দাবোধ অনেক আন্দোলনকারীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে ফেলে। এমনকি তমুদ্দন মজলিশও আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে। তবে ভাষাকে ঘিরে ছাত্রদের মনে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ছাত্ররা ১৯৪৮-এর পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করতেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাঙালি হয়েও বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে ৯ মার্চ (১৯৪৯) মাওলানা আকরাম খাঁ-এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। তারা এর তীব্র নিন্দা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদলিপি পেশ করে। ৩১ ডিসেম্বর (১৯৪৮) ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উক্ত প্রয়াসের সমালোচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে এবং পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা বর্ণমালার আরবিকরণ প্রয়াস নিয়ে বিতর্ক হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কমিটি ৭ ডিসেম্বর (১৯৫০) পেশকৃত রিপোর্টে বাংলা বর্ণমালা আরবিতে লেখার বিরোধিতা করলে সরকারের উক্ত প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হয়।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে ভাষার প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ ঢাকায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটি ৪ ও ৫ নভেম্বর (১৯৫০) ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন করেন এবং পাকিস্তানের সাংবিধানিক মূলনীতি সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা হবে বলে দাবি করা হয়। সংগ্রাম কমিটি ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবশেষে পাক প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ভাষার প্রশ্নটি আপাতত চাপা পড়ে। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ‘উৎসাহী ও সংগ্রামী’ ছাত্র ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। আবদুল মাতিন এর আহ্বায়ক নিষিদ্ধিত হন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

এরপর ১৯৫২ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় খাজা নাজিমউদ্দীনের এক উক্তিতে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলা সফর করতে এসে (২৭-১-১৯৫২) এক জনসভায় তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরূপ ঘোষণা দেন যে, উদুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ৩০ জানুয়ারির সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে '৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমুদ্দন মজলিশ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুব সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ প্রত্তি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্তরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচী সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচী ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। '২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ হতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচীর প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ইংরেজি পত্রিকা 'দেনিক পাকিস্তান অবজারভার' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করার অর্থ একসঙ্গে ৪ জনের বেশি লোকের সমাগম, মিছিল, শোভাযাত্রা, সভা ও সমাবেশ করা আইনবিরোধী।

সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিস্ফুর্ক হয়ে উঠে এবং তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় (২০ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত) ভোটাভুটিতে ১১ জন ১৪৪ ধারা না-ভাঙার পক্ষে ও ৪ জন ভাঙার পক্ষে ভোট দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা না-ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নেতা অলি আহাদের আনীত একটি প্রস্তাব গৃহীত ও সংযোজিত হয়। ঐ প্রস্তাবটি ছিল : 'যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথে নেমে পড়ে, তাহলে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই কমিটি ও বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। এই সিদ্ধান্তগুলো লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে। যদিও পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৮ কিংবা ৪০ ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১৫ জন ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করে। বাকিরা সভায় অনুপস্থিত

লন, না উপস্থিত থেকেও ভোটে অংশ নেননি তা জামা আলোচনা যথেষ্ট সর্বদলীয় ইত্তাবাদ সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের দলীয় সিদ্ধান্ত কী ছিল তা নিয়ে বর্তীতে অনেক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে।

যাহোক, ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ছাত্ররা, যুবলীগের নেতা ও কর্মীগণ এ ছাত্রনেতাদের কয়েকজন পৃথকভাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

১৪৪ ধারা ভাঙা, না-ভাঙার আলোচনা হয় ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাত পর্যন্ত, ফলে গর সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার সময় ছিল না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি স্পতিবার, ৮ ফালুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ২৪ জমাদিয়ুল আউয়াল ১৩৭১ হিজরি। পূর্ব ইগানুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে কে। রাত্তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দুজন দুজন করে গা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে আসে। বেলা ১১টায় ছাত্রসভা শুরু হয়। সভায় ‘সর্বদলীয়’ পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে কর্মপরিষদকে লুঙ্গ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙার পছ্না হিসেবে দশজন দশজন করে এ রাত্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ রাত্তে ১৪৪ ধারা ডঙ্গের বিরুদ্ধে মত দিলেও ছাত্রসভার সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়ে মেনে নেয় এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এদের অনেকেই এদিন প্রেফতার হন। নাব শামসুল হকও পরবর্তীকালে প্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন’।

খণ্ড মিছিলগুলো যখন ১৪৪ ধারা ভাঙতে পথে নামছিল তখন রাত্তায় অপেক্ষমান দশ তাদেরকে প্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কতজনকে পুলিশ আটক করে? অবশ্যে পুলিশ মিছিলকারীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। এতেও ছিলকারীদের ঠেকাতে না পেরে নিক্ষেপ করে শত শত কাঁদুনে গ্যাস। পুলিশী হামলার ধ ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ডিকেল কলেজের মাঝখানের অনুচ্ছ প্রাচীর টপকে মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান কের কাছে আবার জমায়েত হন।’ উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদে গদানকারী সদস্যদের কাছে বাংলাভাষার দাবির কথা পৌছে দেয়া। তখন জগন্মাথ পর অডিটোরিয়ামে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সভা বসত। আইন পরিষদের স্যবৃন্দ যেন অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেন সে তাদেরকে অনুরোধ করাও ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচীর অংশ ছিল।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল নিয়ে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে প্রেফতার বরণ করতে থাকে।

তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে স্ট্রোগান দিয়ে বের হতেই উক্ত পুলিশবাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এমএলএ ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকেন। ছাত্ররা যতই স্ট্রোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে তাড়া করতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতর চুকে পড়ে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে চুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায়

ছাত্রা বাধ্য হয় ইট-পাটকেল ছুড়তে। একদিকে ইট-পাটকেল, আর অন্যদিকে থেকে তার পরিবর্তে কানুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ। ঘটনাস্থলেই আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মতো গুরুতর আহত হন। তাদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন। গুলি চালানোর সাথে সাথেই পরিষ্কৃতির অচিকিৎসা পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে যেন ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন থাকে। মেডিকেল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশ হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবি জানানো হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট, বেতারকেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে।

একুশে ফেরুজ্যারির শহীদ

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় শহীদদের সংখ্যা ও পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরপরই নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন করার কারণে গাশের পরিচয় ও সংখ্যা সম্পর্কে তারা অনেকেই অজ্ঞাত থাকেন, উপরন্তু রাতে পুলিশ কর্তৃক হাসপাতাল থেকে অধিকাংশ লাশ সরিয়ে ফেলার ফলেও পরবর্তীতে নানান প্রশ্নের অবতারণা হয়। সকলেই যে ২১ ফেব্রুয়ারিতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা নয়, আহতদের কেউ কেউ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন সালাম মৃত্যুবরণ করেন ৭ এপ্রিল (১৯৫২)। আবার ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সেই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়েও কেউ কেউ শহীদ হন। ধাহোক, ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উক্ত দিন ও পরে কমপক্ষে ৬ জন যে শহীদ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকারি বিবরণী অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায়। দুঃখজনক যে, আন্দোলনের সংগঠকরা সরকার প্রদত্ত নামের বাইরে শহীদদের আর কারো নাম উক্তার করতে পারেনি। ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম শহীদ হচ্ছেন রফিকউদ্দিন আহমদ। তখন তার বয়স ছিল উনিশ বা বিশ। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে আই.কম. ইতীয় বর্ষে পড়তেন। তিনি কেন ঢাকায় এসেছিলেন তা জানা যায় না। ‘শহীদ রফিককে দাফন করা হয়েছিল আজিমপুর গোরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায়। পরেও তার কবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে সেখানে নতুন কবর পড়েছে।

শহীদ আবুল বরকতের জন্ম ১৬ জুন ১৯২৭ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলাতলে। পিতার নাম শামসুজ্জোহা। ‘স্থানীয় তালিবপুর হাইকুল থেকে তিনি ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ববাংলায় চলে আসেন এবং ঢাকায় তার মাঝা (এসএনজি বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট একাউন্ট অফিসার) মালেক সাহেবের বাসায় পুরানা পল্টন লাইনের ‘বিষুণ্ডিয়া ভবনে’ উঠে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত থাকেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র, অন্ত, ন্যূন, বিনয়ী, চরিত্বান ছিলেন। তিনি অতিরিক্ত লঘা ছিলেন।

১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহেবের প্রচেষ্টায় 'রাত ১০টার দিকে বরকতের লাশ হাসপাতাল থেকে কড়া পাহারায় বের করে আজিমপুর গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বরকতের মামা মালেক সাহেব পরিবারের পক্ষ থেকে কবরের জায়গা কেনার টাকা এবং কাফনের খরচ দেন। পরে বরকতের পরিবার থেকেই তার কবর পাকা করে দেয়া হয়। তাঁর সমাধি এখনো আজিমপুর গোরস্থানে আছে।

শহীদ শফিউর হাইকোর্টের একজন কর্মচারী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভগলি জেলার অন্তর্গত কোম্পগর গ্রামে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি তার জন্ম। কলকাতার গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই.কম. পাস করার পর তিনি চাকুরি নেন। দেশ বিভাগের পর তিনি স্বী আকিলা বেগম ও পরিবারের অন্যায় সদস্যসহ ঢাকায় আসেন এবং হাইকোর্টে চাকুরি পান। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে গুলিবিদ্ধ হন। অনেক ধরাধরির পর শফিউরের পরিবার লাশের কাফন পরিয়ে দেয়ার অনুমতি পায়। রাত তিনটায় আজিমপুরে তাকে দাফন করা হয়। তার সমাধি আজিমপুর গোরস্থানে রাখিত আছে।

শহীদ আবদুল জব্বার ছিলেন একজন দর্জি। গফরগাঁওয়ের পাঁচাইয়া গ্রামের আবদুল কাদেরের পুত্র।

শহীদ অহিউল্লাহর বয়স ছিল মাত্র ৮/৯ বছর। 'রাজমিঞ্চি হাবিবুর রহমানের ছেলে (অহিউল্লাহ) ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে বোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে হঠাতে মাথায় রাইফেলের গুলি লেগে নিহত হয় এবং তার লাশ অপসারিত হয়।'

শহীদ আবদুস সালাম ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হন। তবে শাহাদত বরণ করে এপ্রিল, ১৯৫২। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডাইরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে (ইউন বিডিংয়ে) পিয়নের কাজ করতেন। ঢাকায় ৩৬ বি, নীলক্ষ্মেত ব্যরাকে বাস করতেন। তিনি নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার লক্ষণপুর গ্রামের মোহাম্মদ ফাজিল মিয়ার পুত্র। তার মৃতদেহের সঙ্কান পাওয়া যায়নি।

২১ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ঘটনাবলী

২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকারে প্রতিবাদস্বরূপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে এবং কমপক্ষে ২ মৃত্যবরণ করে। ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি চারদিন 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি। একুশের ঘটনার প্রতিবাদে দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুন্দীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করে। গভর্নর ও স্পিকারের কাছে লেখা পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন:

'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক- এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য

হিসাবে বহাল থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।' মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস করিতে শহীদদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুসারে ড. সাইদ হায়দার নকশার পরিকল্পনা করেন। মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইট, বালি, রড, সিমেন্ট মজুদ ছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মিনার নির্মাণে সেই রসদগুলি ব্যবহৃত হয়। অজ্ঞাতনামা দুই রাজমিস্ত্রি মিনার নির্মাণ করে। তাদেরকে সাহায্য করেন দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র। শহীদ শফিউর রহমানের পিতা ২৪ তারিখে শহীদ মিনার উদ্ঘোধন করেন। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ উক্ত মিনারটি ভেঙে ফেলে।

২৫ মার্চ (১৯৫২) শহীদ আবুল বরকতের ছোট ভাই আবুল হাসনাত ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের এজলাশে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৩৭ ও ১৩২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না— এরই পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু আবেদনকারী অনুরূপ কোনো অনুমতিপত্র দাখিল করতে পারেনি তাই অভিযোগটি খারিজ করে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির পুলিশী ও মিলিটারি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লজ্যন করার তীব্র নিষ্ঠা প্রকাশ করেন। শিক্ষার মাধ্যমের বাংলা প্রবর্তনের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। যে সব রাজনীতিবিদ এতদিন ভাষা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তাঁরা (যেমন এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ) ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সিভিল লিবার্টি কমিটি' বা 'ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি' নামে একটি সমিতি গঠন করে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২৪ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এক সভা অনুষ্ঠিত করে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকারকে বাংলাভাষার দাবি পূরণের জন্য ৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেয় এবং এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে নতুন আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়া হবে বলে উকিল দেয়া হয়।

সরকারও জেল-জুলুমের নীতি অবলম্বন করে। পুলিশ এমনকি চারজন গণপরিষদ সদস্যকে (আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী) জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককেও (প্রস্তর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. বি.সি চক্রবর্তী, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ) গ্রেফতার করে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক নেতা গ্রেফতার জেল-জুলুম এড়ানোর জন্য অনেক রাজনৈতিক নেতা আত্মগোপন করেন। সরকার দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সারাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। আন্দোলনকারীদের শাস্তি করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন।

তাছাড়া প্রদেশবাসীর কাছে তাকে এবং সরকারকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তিনি ১৯৫২ প্রদেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেজিওনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি প্রমাণ করতে চান যে

Android Coding Bd

‘রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পক্ষতে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে জন্য বিদেশী দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।’

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার। জন্য কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করলেও গণপরিষদের অধিবেশনে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধার সম্মুখীন হয়। পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ --গণপরিষদ সদস্য নূর মোহাম্মদ বাংলাভাষা সংক্রান্ত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সুপারিশের বিষয়টি গণপরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করলেও পূর্ববাংলার জন্য কোন মুসলিম লীগ সদস্য তা সমর্থন করেননি। কেবল কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফেসর রাজকুমার চক্ৰবৰ্তী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বজ্রব্য পেশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য সরদার শওকাত হায়াত খান (পাঞ্জাব), সরদার আসাদুল্লাহ জান খান (উ.প.সী.প্র) এবং শেষ্ঠ শুকদেব (সিঙ্গু) বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেন। অবশেষে নূর মোহাম্মদ আনীত প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। এরপর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউল্লাহ পাকিস্তান সংবিধানের মূলনীতি কমিটির যে চূড়ান্ত রিপোর্ট গণপরিষদে উত্থাপন করেন তাতেও ভাষা প্রশ্নটি অনুলোক থাকে। এরফলে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের অসন্তোষ ও ক্ষেত্র আরো বেড়ে যায়।

পরবর্তী ২ বৎসর ভাষার প্রশ্নে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে পূর্ববাংলার জনগণ ভাষা, স্বায়ত্ত্বাসনসহ বিভিন্ন দাবির প্রশ্নে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ‘যুক্তফ্রন্ট’ নামক একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। উক্ত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে যে ২১ দফা নির্বাচনী ওয়াদা ঘোষণা করে তার অন্যতম ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা, ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের জন্য একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।

এই নির্বাচনে পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের ভৱাড়ুবি ঘটে। ফলে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষার আন্দোলনের গুরুত্ব উপলক্ষি করে এবং সে অনুসারে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিংয়ে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের আলোকে ৯ মে ১৯৫৪ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা এবং অন্য আর কোনো প্রাদেশিক পরিষদে সুপারিশ করা হবে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ ইংরেজি ছাড়া উর্দু ও বাংলাতে বজ্রব্য রাখতে পারবেন। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এইভাবে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী আইয়ুব খানকে ভাষার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পরামর্শ

দেন। কিন্তু আইয়ুব খান তাতে কর্ণপাত করেননি। বরং ১৯৭২ সালে জোড়িত তার সংবিধানে তিনি বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল রাখেন (আর্টিকেল-২১৫)।

১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩০ং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাঙলা।

ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে। যেমন কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংখ্যা দাবি করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন দাবি করা হয়, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিক সংখ্যক নিয়োগের দাবি করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাবের কারণে এই দল থেকে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ প্রত্তি নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলের চরম প্রারজয় ঘটে।

ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে এটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তাচেতনা শুরু হয়। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন এক ধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উচ্চারণ করা হয়েছে তখনই পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে।

ভাষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে প্রচলন রাজনৈতিক শক্তিতে ঝুক্তিরিত করে। ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই (এপ্রিল) পূর্ববাংলায় ছাত্র ইউনিয়ন নামে ছাত্রসংগঠন জন্মালাভ করে। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে তাই দেখা যায় ছাত্রসমাজই ছিল মূল শক্তি। যে কোনো সরকারের যে কোনো অন্যায় দুনীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ করে ছাত্রসমাজ।

ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বৃক্ষজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রত্তি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী আন্দোলনসমূহে আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি।

ভাষা আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবর্তন করেন। পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেসদলীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভাষার দাবিতে কথা বলেছেন, আর রাজপথে অকংগ্রেসীয়রা ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃক্ষি পেয়েছে। আওয়ামী-মুসলিম লীগ নামের বৃহৎ রাজনৈতিক দলটি ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির রাজনীতি ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করে এবং ১৯৫৫ সালে পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে পার্টিকে সকল ধর্মের লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে পরবর্তী আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই চলে যায়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্রাবাদ অংশগ্রহণ করে ^{Anglo-Bengali} এর ফলে ছাত্রীদের বোরখা পড়ার অভ্যেস কমে যায়। পরবর্তীতে সভা-সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের ধারা সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল।

ହକ-ଭାସାନୀ-ସୋହରାଓୟାର୍ଡି ଯୁକ୍ତଫୁନ୍ଟ, ୧୯୫୪ ମେ ମାସରେ ନିର୍ବଚନ ଓ ପରିଣତି
କ. ୧୯୫୪ ମେ ମାସରେ ପୂର୍ବବାଂଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପରିଷଦେର ନିର୍ବଚନ

অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৪ আগস্ট
 ১৯৪৭-এ ঘোষিত Provincial Legislative Assembly Order. 1947 অনুসারে
 ১৯৪৬-এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক
 পরিষদের সদস্যে পরিণত হয়। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২
 সালে। কিন্তু উক্ত পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
 এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের
 ৬১(২) নং ধারা সংশোধন করে সিঙ্কান্ড গ্রহণ করেন যে, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের
 নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের
 একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন্নের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী প্রাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক
 মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান। ফলশ্রুতিতে
 নূরুল আমিন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ The East Bengal
 Legislative Assembly (Continuation) Act. 1953' পাস করার মাধ্যমে পূর্ববাংলা
 ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃক্ষি করেন। অবশ্যে ১৯৫৪ সালের
 ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,

- ক.** নির্বাচন হবে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে ।
খ. অমুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে ।
গ. পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে নিম্নরূপ :

১. মুসলমান আসন	২৩৭টি	(৯টি মহিলা আসনসহ)
২. সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩টি	(১টি মহিলা আসনসহ)
৩. তফশিলি জাতি হিন্দ	৩৮টি	(২টি মহিলা আসনসহ)
৪. বৌদ্ধ	২টি	
৫. খ্রিস্টান	১টি	
সর্বমোট		৩০৯টি (১২টি মহিলা আসনসহ)

১৯৫১ সালের সেক্সাস রিপোর্টকে ভিত্তি করে আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১

লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্মাণ করা হয়। সারণী-১-এর জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক আসন বণ্টন দেখানো হল। সমস্ত পূর্ববাংলা যেখানে মুসলমানদের জন্য ২২৮টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়, সেখানে বর্ণ-হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩০টি এলাকায় ও তফশিলি হিন্দুদের জন্য ৩৬টি এলাকায় বিভক্ত হয়। স্বভাবতই বর্ণ-হিন্দু বা তফশিলি হিন্দুদের নির্বাচনী এলাকা মুসলমানদের নির্বাচনী এলাকার চেয়ে অনেক বড় ছিল।

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অন্য আসনেও মহিলাপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। মহিলাদের জন্য যে ১২টি আসন সংরক্ষিত ছিল সে আসনসমূহের নির্বাচনে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মহিলাদেরই ভোটদানের অধিকার ছিল। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বসবাসরত মহিলা ভোটারদের প্রত্যেকের ভোট ছিল ২টি করে- ১টি নিজ সম্প্রদায়ের মহিলা (সংরক্ষিত) প্রার্থীর জন্য, অন্যটি নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/মহিলা প্রার্থীর জন্য। মহসূল এলাকায় (মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে) বসবাসরত মহিলা ভোটারের ভোট ছিল একটি- নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/মহিলা প্রার্থীর জন্য।

সারণী-১ : জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টন

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	মোট ভোটার সংখ্যা	আসন প্রতি জনসংখ্যা	আসন প্রতি ভোটার সংখ্যা
ক) মুসলমান	২২৮ সং/মূৰ	৩,২২,২৬,৬৩৯	১,৫১,৫৯,৮২৫ সং/ম ১,৬১,৯৬৬	১,৪১,৩৪৫	৬৬,৪৯০ সং/ম, ১৭,৯৯৬
খ) সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩০ সং/ম ১	৪২,২৭,৯৮২	২০,৯৫,৩৫৫ সং/ম ২৫,৭২৬	১,৪০,৯৩৩	৬৯,৮৪৫ সং/ম ২৫,৭২৬
গ) তফশিলি হিন্দু	৩৬ সং/ম ২	৫০,৫২,২৫০	২৩,০৩,৫৭৮ সং/ম ১৪,৭৮৫	১,৪০,৩৪০	৬৩,৯৮৮ সং/ম ৭,৩৯৩
ঘ) বৌদ্ধ	২	৩,১৮,৯৫১	১,৩৬,৮১৭	১,৩৯,৮৭৫	৬৮,২০৯
ঙ) খিস্টান	১	১,০৬,৮০৭	৪৩,৯১১	১,০৬,৮০৭	৪৩,৯১১
মোট	২৯৭+১২	৪,১৯,৩২,৩২৯			

সং/ম= সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য মহিলা ভোটার সংখ্যা

১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন। ভোটার তালিকায় অসংখ্য ভুলভুলি ছিল। অনেকের নামই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আহমদ রাজা-এর নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিল না বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি পেশের শেষ তারিখ রাজনৈতিক নেতৃত্বদের দাবির মুখে ১০ দিন বাড়ানো হলেও আপত্তি পেশের মোট সংখ্যা শতকরা

এক ভাগেরও কম ছিল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৩। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬ এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১,০৫,৭১,৯৪৯ জন। ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৪। মনোনয়ন পত্র বাছাই ১৬,১৭ ও ১৮ জানুয়ারি (১৯৫৪) এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১ জানুয়ারি (১৯৫৪)।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান আসনে যে-সকল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেগুলো হচ্ছে-মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, যুব লীগ, গণতান্ত্রী দল, খেলাফতে রক্ষানী পার্টি প্রভৃতি। অমুসলমান আসনে যে দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফশিলি ফেডারেশন, গণসমিতি, অভয় আশ্রম (কুমিল্লা), পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রী দল প্রভৃতি। কম্যুনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ মুসলমান আসনে এবং হিন্দু সদস্যগণ হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমান আসনে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলামী ‘যুক্তফুল্ট’ গঠন করে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। হিন্দু আসনের নির্বাচনে গণসমিতি, অভয় আশ্রম ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল ‘সংখ্যালঘু যুক্তফুল্ট’ গঠন করে।

যুক্তফুল্ট গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী মিলে ‘যুক্তফুল্ট’ নামক একটি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলেন। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘মুসলিম লীগ সরকার’ বিরোধী একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে ‘যুবলীগ’ সকল বিরোধীদলের এক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরুতেই ‘গণতান্ত্রিক দল’ ও ‘আওয়ামী লীগ’ ঐ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দও মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠন করতে প্রচারাভিযান চালায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিশেন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের উদ্দেশ্যে সমন্বন্ধ দলসমূহ নিয়ে যুক্তফুল্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারির সঙ্গে সঙ্গে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁর দলের ভরাভুবি ঘটলে তিনি রাজনীতি থেকে নির্বাসন গ্রহণ করেন। নূরুল আমিন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হককে পূর্ববাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পুনরায় রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকারি চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে তাঁর ১৯৩০-

এর দশকের নিজস্ব দল কৃষক-প্রজা পার্টির পুনরুজ্জাবত করেন এবং এর নামকরণ করেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি (KSP) আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

যুক্তফ্রন্টের আরেক শরিকদল- নিজামে এছলাম এর পূর্ব নাম ‘জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম’। ১৯৫৩ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্বপাক জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের দুদিন ব্যাপী অধিবেশন শেষে তাদের ধর্মীয় সংগঠনটিকে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করে এর নাম ‘নিজামে এছলাম’ রাখা হয় এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে,

যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজামে এছলাম ও উহার কার্যক্রম স্থীকার করিয়া নিজামে এছলাম দলের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাদের সহিত ‘নিজামে এছলাম দল’ যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে রাজি আছেন।

এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দলের সভাপতি মওলানা আতাহার আলীর ওপর অর্পিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝতে পেরে নিজামে এছলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নিজামে এছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগ ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ, কিন্তু ফ্রন্টের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজামে এছলামীর নেতৃত্বদের বিরোধিতায় এই দলগুলিকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে কিথ ক্যালার্ড উল্লেখ করেছেন যে,

The Ganatantri Dal had aligned itself with the United front during the campaign and some of its members had secured United Front nominations for Muslim seats. It seems probable that a few members of the communist party also secured United front nominations although this was not publicly announced.

এ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল সেন উল্লেখ করেছেন যে, ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হয়। নাজমা চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, অনেক বামপন্থী-নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনে খেলাফতে রক্বানী পার্টিরও ইচ্ছে ছিল ‘যুক্তফ্রন্ট’-এর শরিক দল হওয়ার। এই উদ্দেশে ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগ থার্ড লেনে পার্টির সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়ামের এক সভায় লীগ-বিরোধী সম্প্রিলিত যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু খেলাফতে রক্বানী পার্টিকে ‘যুক্তফ্রন্ট’ভুক্ত করা হয়নি।

অগত্যা এই পার্টি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবেদন করে নির্বাচন পুস্তিক্ষেপে মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এবং বাকি ২২৬টি আসনের জন্য রুক্বানী পার্টি যুজ্ফুন্টের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।

নির্বাচনে ছাত্রসংগঠন সমূহের ভূমিকা

যুজ্ফুন্ট গঠনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। নির্বাচনী কর্মকা শুরু হলে এই দুই সংগঠন 'যুজ্ফুন্ট কর্মী শিবির' গঠন করে এবং গ্রামপর্যায় পৃষ্ঠাত এর শাখা বিস্তৃত হয়। সংগঠকদ্বয়ের সমর্থক ছাত্রকর্মীরা সারাদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্বোধন নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে। নির্বাচনে যুজ্ফুন্টকে সমর্থন করার পিছনে মূল কারণ ছিল এই যে, যুজ্ফুন্টের ২১-দফার ৯, ১০ এবং ১১নং দফায় উল্লেখিত দাবিসমূহ ছিল ছাত্রদের স্বার্থ-সম্পর্কিত। তাছাড়া ১৯৫২ সালে বাংলাভাষার দাবিতে ছাত্রবৃন্দ যে আত্মত্যাগ করেছিল, ২১-দফার ১ম দফাটি ছিল সে-বিষয় সম্পর্কিত। সুতরাং ছাত্রদের দাবিদাওয়া বাস্তবায়নের স্বার্থেই তারা যুজ্ফুন্টকে সমর্থন জ্ঞাপন করে।

অপরপক্ষে সরকারপক্ষী ছাত্রসংগঠনটি (All East Pakistan Muslim Students League) মুসলিম লীগকে সমর্থন করে।

নির্বাচনে ইসলামী দলসমূহের ভূমিকা

কিছু ইসলামী দল বা সংগঠন এবং ইসলামী ব্যক্তি নিজেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও মুসলিম লীগকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন। নিচে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল :

জমিয়তে হেজবুল্লাহ

এটি ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচন সম্পর্কে এ দলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ :

জমিয়তে হেজবুল্লাহ আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে প্রার্থী খাড়া করাইবে না বলে দল বিশেষকে সমর্থন করিবে না। দ্বিজাতিতন্ত্র ও নেজামে এছলাম সমর্থক কোনো নির্বাচন প্রার্থী জমিয়তে হেজবুল্লাহর 'একরার নামায' দন্তখত করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উক্ত ব্যক্তির জনসমর্থন ও তাহার নিজস্ব যোগ্যতা পুর্খানুপূর্খরূপে বিচার করিয়া জমিয়ত তাহাকে সমর্থন করিবে।

কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর সম্পাদক মওলানা আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন :

পাকিস্তানে আদর্শ এছলামী শাসন কায়েম, জাতীয় সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য দীনদার মুসলমানদের পক্ষে মোছলেম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া বর্তমানে শরীয়তসম্মত অন্য কোনো পথ নেই। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে

জমিয়তে হেজবুল্লাহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই জাতির প্রতিষ্ঠান গঠন করে আসেন এবং তার মুসলিম সমর্থন করিবে।

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে এই দল ঘোষণা করে যে, 'লীগকে সমর্থন করা ওয়াজেব।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র-হেজবুল্লাহ

এটি জমিয়তে হেজবুল্লাহর ছাত্রকুল। নির্বাচনে এই দলের ভূমিকা সম্পর্কে দলের প্রচার সম্পাদক মওলানা ছাহেব আলী ঘোষণা করেন :

...মুসলমানদের একমাত্র খালেছ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের স্থান বিরোধী খুচড়ি দলের অনেক উৎর্ধৰে। মরহুম ফুরাফুরা ও শর্ফীনার পীর ছাহেবদয় ও হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব প্রমুখ অলী আল্লাহগণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।... জাতীয় বর্তমান সংকট মূহূর্তে মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের দীনদার ছাত্রদের নীরব থাকিলে বা কংগ্রেসী ওলামাদের এশারায় ভূলপথে চলিলে দেশ ও জাতির পক্ষে তাহা মারাত্ক হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই আজ আমি খোলাখুলিভাবে দীনদার ছাত্রদের প্রতি আবেদন করি যে, পাকিস্তানে নেজামে ইছলাম কায়েম, জাতির সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানকে গুণ-শক্তির হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়া

এটিও একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও পূর্ববাংলার ওলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে এক আবেদনে এই দলের সম্পাদক মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানে নেজামে ইছলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যকার খুটিনাটি মতানেক্য ভূলিয়া এক কর্মপত্র অবলম্বন করুন।

জামায়াতে এছলামী

এই দলটি ইসলামী রাজনৈতিক দল হয়েও পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'অনেছলামিক' বলে অভিহিত করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে এছলামীর আমীর চেয়ারী আলী আহমদ খান নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন যে, 'ইহা দেশে অসাধুতার বিষ ছড়াইতে সাহায্য করিবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সকল অনর্থের মূল।'

বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের মনোভাব

শর্ফীনার পীর সাহেব তাঁর অনুসারীদেরকে মুসলিম লীগকে সমর্থনের আহ্বান জানান।

মহামান্য আগা খান তাঁর পাকিস্তানস্থিত বিভিন্ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবর্গ এবং জামাতের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত বাণীতে পূর্ববাংলার নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মন্তব্য করেন, 'লীগ জয়ী না হলে পাকিস্তানে ইসলাম দুর্বল হবে।

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল

কাফি তাঁর অনুসারীদেরকে আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ দলকেই অসম প্রতিটি প্রতিক্রিয়াকেই জয়যুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।

এইভাবে আমরা দেখি বিভিন্ন ইসলামী দল ও ব্যক্তি প্রকারাত্তরে মুসলিম লীগকে সমর্থন জানান।

তবে এককালের অনেক বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা যে এই নির্বাচনে নিশ্চুপ থাকেন তার প্রমাণ খাজা নাজিমউদ্দীন। নির্বাচনে কোনো দলকেই সমর্থন না জানিয়ে তিনি নিশ্চুপ থাকেন এবং একসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ‘আমি রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়াছি।

নির্বাচনে হিন্দু দল ও জোট

তৎকালীন পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে অমুসলমান আসনের সংখ্যা ছিল ৭২। এর মধ্যে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ১। নির্বাচনে মুসলমান আসনগুলো মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য হিন্দু-আসনের নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন হবে— এই বিবেচনায় যুক্তফ্রন্টের ইঙ্গিতে ‘সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট’ গঠিত হয়। ‘সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের’ শরিক দলগুলো ছিল ‘গণসমিতি’, কুমিল্লার ‘অভয় আশ্রম’ এবং ‘পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল’। ‘গণসমিতির’ নেতৃবৃন্দই এই ফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেন। ‘গণসমিতি’ হচ্ছে ‘পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস’ থেকে বেরিয়ে আসা নেতা-কর্মীদের সংগঠন। ১৯৪৭-এর পর ‘পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস’ গঠনের সময় কিছু নেতা ‘কংগ্রেস’ বাদে অন্য নামে দলগঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাদের প্রস্তাব অগ্রহ্য করা হলে তারা ১৯৪৮-এর জুলাই মাসে ‘গণসমিতি’ গঠন করেন। এই দলে শুধু কংগ্রেস সদস্যরাই যোগ দেননি, ‘সমাজতন্ত্রী দল’, ‘বিপ্রবী সমাজতন্ত্রী দল’, ‘ফরওয়ার্ড ব্রক’ এবং অন্যান্য সংগঠনের কিছু হিন্দু নেতাকর্মীও যোগ দেন।

১৯৪৭-এর পর কংগ্রেস ও গণসমিতি প্রধানত বর্ণ-হিন্দুদের সংগঠন ছিল। সে-সময় তফশিলি হিন্দুদের সংগঠন ছিল ‘তফশিলি জাতি ফেডারেশন’। ১৯৪৭-এর পূর্বে এবং পরে এই সংগঠনের নীতি ছিল মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করা। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা সরকারের কেবিনেটে এই দল থেকে দলের প্রেসিডেন্ট মি.ডি.এন. বারুংই মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা হবে, না যৌথ নির্বাচনব্যবস্থা হবে— এই ইস্যুতে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে দল বিভক্ত হয়। ডি.এন.বারুংই পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অংশের নেতৃত্ব দেন মি. রসরাজ মওল। অবশেষে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় বিরোধী অংশের সম্মেলন হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী উক্ত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রসরাজ মওলের অংশ এবং ডি.এন. বারুংইয়ের অংশ পৃথক প্রার্থী মনোনয়ন দেন।

নির্বাচনে ডি.এন. বারুইয়ের অংশের ভরাদুবি ঘটে। | Android Coding Bd

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জোট ও দলের প্রার্থী সংখ্যা:

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জোট ও দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

(ক) মুসলমান আসন (মোট আসন সংখ্যা ২৩৭)

মুসলিম লীগ	২৩৭ জন
যুক্তফ্রন্ট	২৩৪ জন
খেলাফতে রক্বানী পার্টি	৫ জন
স্বতন্ত্র	৫৪২ জন
মোট	১০১৮ জন (মহিলা প্রার্থীসহ)

(খ) অমুসলমান আসন (মোট আসন সংখ্যা ৭২)

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	৩৯জন
তফশিলি জাতি ফেডারেশন	৩২ জন (ডি.এন.বারুই এন্প)
তফশিলী জাতি ফেডারেশন	৩৬ জন (রসরাজ ম ল এন্প)
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৯ জন
কম্যুনিস্ট পার্টি	১০ জন
বৌদ্ধ	১২ জন
খ্রিস্টান	১ জন
স্বতন্ত্র (গণতন্ত্রী দলসহ)	১২৩ জন
মোট	২৭২ জন

সারণী-২ এ নির্বাচনে সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থী সংখ্যা উল্লেখিত হল।

সারণী-২ নির্বাচনে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা		বিলা প্রতিষ্ঠানিতায়		অংশগ্রহণকারী প্রার্থী সংখ্যা		আসনপ্রতি গড় প্রার্থী সংখ্যা	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
মুসলমান	২২৮	৯	×	×	৯৮৬	৩২	৪.৩	৩.৬
অমুসলমান সাধারণ	৩০	১	২	১	১০১	×	৩.৬	১
তফশিলি	৩৬	২	×	১	১৫১	৩	৪.২	৩
বৌদ্ধ	২	×	×	×	১২	×	৬	১
খ্রিস্টান	১	×	১	×	১	১	১	১
মোট	২৯৭	১২	৩	২	১২৫০	৩৫		

পূর্ববাংলা প্রথম ব্যবস্থাপক পরিষদের (১৯৪৭-৫৪) ৯৮ জন মুসলিম লীগ দলীয়

সদস্যের মধ্যে ৪২ জন মুসলিম লীগের নমিনেশন Android Coding Bd প্রতি হন। এদের মধ্যে ব্যবাত হোসেন (আওয়ামী লীগে যোগ দেন) এবং ইউসুফ আলী চৌধুরীর (কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন) নাম উল্লেখযোগ্য। ৮ জন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেন। এরা মুসলিম লীগ কিংবা যুক্তফন্টের নমিনেশন লাভে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। ৩৯ জন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।

বিভিন্ন দল ও জোটের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ও প্রচারাভিযান

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগের অন্যতম বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের অর্থ তা ও সংহতি বজায় রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করা, পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গার মোহাম্মদ আলী ঢাকার এক নির্বাচনী সভায় বলেন যে, ‘মুসলিম লীগই একমাত্র দল যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একেব্রে বদ্ধন আটুট রাখতে সক্ষম।’ খোদা না করুন, সামনের নির্বাচন যদি অন্য কোনো দল নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হবে। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন যে, ‘যারা স্বাধীন পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না, যারা অর্থ ভারতের স্বপ্ন দেখে তারা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।’ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে তাহলে তিনি গণপরিষদে তা সমর্থন করবেন। পূর্ববাংলার ধর্মপ্রাণ নিরীহ মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য মুসলিম লীগ ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের এক অটুট রাখার আহবান জানান। মোহাম্মদ আলী জিলাহের ভগী মিস ফাতেমা জিলাহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলিম লীগের পক্ষ নেন। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে ডি঱ জনসভায় বলেন যে, ‘মুসলমান ভোটারদের উচিত কম্যুনিস্ট ও হিন্দু ঘড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেয়া।’ মোহাম্মদ আলী জিলাহর জন্য দিবস উপলক্ষে এক বেতার বক্তৃতায় পূর্ব বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে মিস জিলাহ বলেন:

আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনাদিগকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

নির্বাচনের ফলাফলের উপরই পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করুন এবং অনেক্য ও বিভেদ দৃষ্টিকারী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন যে, এই নির্বাচন অনেকটা গণভোটের মতো। নির্বাচনের ফলাফলে নির্ধারণ হবে যে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, না ভারতভুক্ত হবে।

নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ‘আজাদ’ পত্রিকায় একটি দীর্ঘ নির্বাচনী ইশতেহার প্রচারিত হয়। উক্ত ইশতেহারের বক্তব্য বিষয় থেকে এই দলের মনোভাব অবলোকন করা সম্ভব।

যুক্তিক্ষেত্র
 ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তিক্ষেত্র ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া ঘোষণা করে। নিম্নে
 ২১ দফার দাবিগুলো উল্লেখ করা হল :

যুক্তিক্ষেত্রের একুশ দফা

- নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না
 এবং ইসলামের সাম্য ও ভাস্তুত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা
 হইবে।
১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।
 ২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বতু উচ্ছেদ ও রহিত
 করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উন্নত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের
 খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের
 প্রথা রহিত করা হইবে।
 ৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ,
 পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাৰ্বীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা
 হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেক্ষারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট
 সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াণ্ড করা
 হইবে।
 ৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে
 সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্প উন্নতি সাধন করা হইবে।
 ৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত উপকূলে কুটিরশিল্প ও
 বৃহৎশিল্পে লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিমীগ মন্ত্রিসভার
 আমলের লবণের কেলেক্ষারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির
 ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াণ্ড করা
 হইবে।
 ৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজে আণ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের
 পুনর্বস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।
 ৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা
 করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।
 ৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী
 করিয়া শিল্প ও খাদ্য দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের
 মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকলপ্রকার অধিকার
 প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।
 ৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা
 হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংকার করিয়া শিক্ষাকে Andriod Pdf Download করিয়া বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে ।
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়স্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে শস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে ।
১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে । যুক্তফ্রন্টের কোলো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না ।
১৩. দুনীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘূষ রিশওয়াত বঙ্গ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াণ্ড করা হইবে ।
১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনেন্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য-আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরকুশ করা হইবে ।
১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে ।
১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে ।
১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পরিত্র স্মৃতিচিহ্নস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে ।
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে ।
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়স্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চল নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে । আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে ।

২০. যুজ্ফন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আনুমতি নাইবে না।
আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।
২১. যুজ্ফন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুজ্ফন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

(সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুক্ত: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৩৭৪)

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগ বিরোধী যুজ্ফন্টের প্রেরণাশক্তি ছিল ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন। তাই যুজ্ফন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরণীয় করার অতিরিক্ত উপায় হিসেবে ২১ দফার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। আবুল মনসুর আহমেদ ২১-দফার খসড়া প্রণয়ন করেন।

২১-দফা বিশ্বেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, প্রদেশের জন্য অধিক স্বায়ত্ত্বাসন ও প্রশাসনে বাঙালির অধিকসংখ্যক নিয়োগ প্রভৃতি দিক অন্যতম।

তবে ২১-দফার বিশ্বেষণে কিছু বিষয়ের অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ সালের পূর্ববাংলায় জমিদারি স্বত্ত্ব বিলোপ করে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি মালিকানার উচ্চতর সিলিং নির্ধারণ করলেও মুসলিম লীগ সরকার এই সিলিং বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কারণ, মুসলিম লীগ জোতদার শ্রেণীর সংগঠন ছিল। যুজ্ফন্টের অনেক নেতা জোতদার শ্রেণীর ছিলেন। স্বভাবতই যুজ্ফন্টের ২১-দফায় সিলিং-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি, তবে ভূমিহীন ভোটারদেরকে আকৃষ্ট কার জন্য বলা হয় যে, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ‘উদ্বৃত্ত’ জমি বিতরণ করা হবে। পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যুজ্ফন্ট শরিকদলের মতের ভিন্নতা ছিল। ডানপন্থাগণ পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার নীতিতে বিশ্বাসী হলেও বামপন্থী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। ফল পররাষ্ট্র ব্যাপারে ২১ দফা নিশ্চৃণ্ণ থাকে। এতদসত্ত্বেও ২১-দফার দাবিগুলি ভোটারদের মন জয় করে।

খেলাফতে রুববানী পার্টি

এই দলের নির্বাচনী-মান্যিফেস্টোর সারাংশ নিম্নরূপ:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তামুদনিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা, ব্রিটিশ কর্মনওয়েলথ ত্যাগ, ইঙ্গ-মার্কিন ও রাশিয়া এই ‘জড়বাদী’ ব্লকের দলে পাকিস্তানের নিরপেক্ষতা রক্ষা, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনাবিচারে আটক রাখার নীতি বাতিল। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, বিনাবিচারে আটক রাজবন্দিদের মুক্তি, পাট সহ কল একচেটিয়া ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রায়ান্ত্বকরণে, বিনা খেসারতে সমস্ত কর আদায় ভূমিক্ষেত্রের বিলোপ সাধন, ভূমিনির্ভর ভূৰ্বৃচ্ছ্যত নাগরিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত বচ্টনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে

জমি বন্টন; লবণ, তামাক, সুপারিশ প্রভৃতি নিত্য ধূসর প্রক্রিয়া ও মানবসম্মতি কর বাতিল, অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাধীনতা এবং শিক্ষা ও নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী শাসনবিভাগীয় সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার এবং ঘূর্ষ-দূনীতি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

গণতন্ত্রী দল

নির্বাচন উপলক্ষে গণতন্ত্রী দল 'দশ দফা' ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে।

১. ব্রিটিশ কর্মনওয়েলথ ত্যাগ ও পাকিস্তানকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।
২. পাকিস্তানে বাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন ও সুদ বাজেয়াঙ্গ করণ।
৩. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। জমিদারদের দখলি অতিরিক্ত জমি বাজেয়াঙ্গ করে কৃষকদের মধ্যে উহার পুনর্বন্টন।
৪. পাটের রফতানি ব্যবসা জাতীয়করণ, উহার বাজার সম্প্রসারণ ও পাটের সর্বনিম্ন ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা দান।
৫. দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি জাতীয় মূলধন নিয়োগে সক্রিয় উৎসাহ দান।
৬. দেশবাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিদান, অস্ত রীগাদেশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার, সকল কালাকানুন ও অর্ডিনেন্স রদকরণ এবং ধর্মচর্চা, সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান।
৭. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান।
৮. বেকারত্ব ও ব্যয়বহুল জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশবাসীর বাঁচার অধিকার কামোদ করা।
৯. জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, আবেতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।
১০. পাকিস্তান-ভারত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য

কংগ্রেস

নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচনী বোর্ডের সেক্রেটারি মি. মনোরঞ্জন ধর বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পূর্ববঙ্গ তফশিলি জাতি ফেডারেশন (রসরাজ মণ্ডল প্রঞ্চ)

এই দলের লক্ষ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন এবং তফশিলিদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের দাবি বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

নির্বাচনের প্রস্তুতি

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ২৪ ডিসেম্বর (১৯৫৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় এবং জনগণের অবগতির জন্য তা রেজিস্ট্রি অফিসে, রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যেক মৌজার সরদারের অফিসে, সিলেট জেলায় সার্কেল সাব-ডেপুটি কালেক্টরের অফিসে, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে, মহকুমা হাকিমের অফিসে, জেলা জজের, সাব জজের ও মুল্লেফের অফিসে, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়।

ছাপানো, কিংবা টাইপ-করা কিংবা হাতেলেখা ফরমে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নিয়ম করা হয়। তফশিলি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণকে ২৫০ টাকা জামানত দাখেল করতে হত। তফশিলি নির্বাচন এলাকার প্রার্থীগণকে ১০০ টাকা জামানত দাখেল করতে হত। 'রেভিনিউ ডিপোজিট' খাতে টাকা জমা দিতে হত।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালটবাক্সে ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরূপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'হারিকেন' প্রতীক এবং যুক্তক্রন্ত 'নৌকা' প্রতীক গ্রহণ করে।

পূর্ববাংলায় প্রায় ৫ হাজার ১০টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য রিজার্ভসহ ৭ হাজার ৪ শত ৮৩ জন প্রিসাইডিং অফিসার ও আনুমানিক ২৪ হাজার পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। গেজেটেড অফিসার, কলেজের প্রফেসর, হাইস্কুল ও হাই মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিজাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। কোনো ভোটার যাতে একবারের বেশি ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদান কালে তার আঙুলে অমোচনীয় (যা সহজে ওঠে না) কালির ছাপ দেওয়ার বিধান করা হয় এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে যাতে পাঁচ মাইলের বেশি হাঁটতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে বৃথৎ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য দেড় লক্ষাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয় এবং প্রায় দুই কোটি ব্যালটপেপার ছাপানো হয়। নিয়ম করা হয় যে, ভোটগ্রহণ ৫ দিনে (৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ) সমাপ্ত হবে। ভোটগ্রহণ কার্য সকাল ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে; মাঝামাজে ১২.৩০ মিনিট থেকে ১.৩০ মিনিট-এই এক ঘন্টাকাল ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকবে। বিকেল ৫.৩০ মিনিটে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আবেষ্টনী বন্ধ করা হবে। ঐ সময়ের পর আর কোনো নতুন লোকে আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আবেষ্টনীর মধ্যে যারা থাকবেন ৪.৩০ মিনিটের পরও তাদের ভোট নেওয়া হবে।

এই নির্বাচনে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্য ডাকযোগে ভোট দেয়ার সুবিধা দেয়া হয়। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়:

যে-সকল ভোটার কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কাজে নিজ এলাকা হইতে দূরে আছেন, অথবা যাহারা নিবর্তনমূলক আইনে আটক আছেন, তাহারা ডাকযোগে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহ নির্বাচন সম্পর্ক করার সুষ্ঠু পদক্ষেপ এই বিভাগে দেখানো উদ্দেশ নাই। কিন্তু নির্বাচন যাতে 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' হয় সেজন্য বিরোধী দলসমূহের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিরোধী দল বিভিন্ন রূকমের দাবি উত্থাপন করে। জনাব ফজলুল হক প্রদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী কমিশনারের নিকট নিম্নলিখিত দাবিগুলো পেশ করেন।

১. মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করিতে এবং নির্বাচনের পূর্বে মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের বিকল্পে আপিলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।
২. কোনো লোক যাহাতে দুইবার ভোটদান করিতে না পারে, তাহার জন্য ভোটারদের হাতের নথে যে কালির দাগ শীঘ্ৰ মুছিয়া না যায় সেইরূপ কালির চিহ্ন দিতে হইবে।
৩. দলসমূহ যাহাতে শুমির আশ্রয় লইতে না পারে, তাহার জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সিকি মাইলের মধ্যে স্প্রে-গান উচ্চারণ এবং অন্তর্শন্ত্র ও লাঠিসৌটা বহন নিষিদ্ধ করিতে হইবে।
৪. ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করিতে এবং ভোটদাতাদের যাতায়াতের এবং স্থান সংকুলানের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৫. পুলিশ কর্মচারীসহ সকল সরকারি অফিসার যাহাতে পক্ষপাতমূলক তৎপরতা শুরু না করেন, তজন্য এখনই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। নির্বাচন কমিশনার জনাব আজফার 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাণপণ প্রয়াস পাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রূতি দেন।

মওলানা ভাসানী 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নিয়ে পূর্ববাংলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গভর্নর মওলানা সাহেবকে প্রতিশ্রূতি দেন যে,

নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মোছলেম লীগ ও বিরোধী দলগুলোকে সমান সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোনো সরকারি কর্মচারী মোছলেম লীগের প্রচারকার্যে সহায়তা করিতেছে একেপ সংবাদ পাইলে তাহার বিকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। গভর্নর আরও বলেন যে নির্বাচন যাহাতে শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুতার সহিত সম্পর্ক হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে নিজামে এছলাম তার কাউন্সিল অধিবেশন শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস করে:

সরকারি খরচে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনী প্রচারণা চালানো সম্পর্কে গভীর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভাসিয়া দেওয়ার দাবি জানাইয়া দলমত নির্বিশেষে সকলকেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাইবার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে মাইক ইত্যাদি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্নরের নিকট দাবি জানানো হয়।

নির্বাচন শাস্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আজাদ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, 'নির্বাচনী দিবসের পূর্বে নানাজনে নানা প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু'

গতকল্য ঢাকা শহরের ভোটারগণ এবং নির্বাচনের সাহস্র সংযুক্ত পক্ষের জন্ম ও ব্যক্তি বিশ্বয়কর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়া সকলকেই স্তুতি করিয়া দিয়াছেন.... পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উন্নীর্ণ হইয়াছে।

আজুলে অমোচনীয় কালি (indelible ink) লাগানোর বিধান করায় এবং East Bengal Electoral Offences Ordinance জারি করায় নির্বাচনে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা হয়নি, কিংবা জাল ভোট হয়নি।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনে মুসলমান আসনে ৩৭.৬০% ভোট পড়ে। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে অনীহা। প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হয় ১৫ মার্চ (১৯৫৪) থেকে। সরকারি ফলাফল ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল।

৭২টি অন্যস্থানের ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪টি আসন
তফশিলি ফেডারেশন	২৭টি আসন (রসরাজ মণ্ডল এন্প)
সংখ্যালঘু যুক্তফন্ট দল (৩টি)	১৩টি আসন (এর মধ্যে গণতন্ত্রী
কম্যুনিস্ট পার্টি	৪টি আসন
বৌদ্ধ	২টি আসন
খ্রিস্টান	১টি আসন
স্বতন্ত্র	১টি আসন
মোট	৭২টি আসন

২৩৭টি মুসলমান আসনের ফলাফল

যুক্তফন্ট	২১৫টি আসন
মুসলিম লীগ	৯টি আসন
খেলাফতে রক্বানী পার্টি	১টি
স্বতন্ত্র	১২টি আসন
মোট	২৩৭টি আসন

মুসলমান আসনের স্বতন্ত্র সদস্যদের ৮ জন যুক্তফন্টে যোগ দেন, ফলে যুক্তফন্টের সদস্যাসংখ্যা ২২৩-এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করলে ত্রি দলের সদস্য সংখ্যা ১০ হয়।

সারণী-৩-এ মুসলমান আসনের জেলাভিস্তিক ফলাফল দেয়া হল। এতে দেখা যায় যে, ৮টি জেলায় যুক্তফন্ট একচেটিয়াভাবে সবগুলি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ কেবলমাত্র রংপুর, যশোর, সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায় আসন পায়। খেলাফতে রক্বানী

পাটি সে আসনটি লাভ করে তা সিলেট জেলায়। Android Coding Bd
 সারণী-৩ মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল

ক্রম নং	জেলা	মোট আসন	যুক্তফুট	লীগ	রক্ষানী পার্টি	স্বতন্ত্র
১	দিনাজপুর	৬	৬	-	-	-
২	রংপুর	১৬	১১	৮	-	১
৩	বগুড়া	৮	৮	-	-	-
৪	রাজশাহী	১৩	১২	-	-	১
৫	পাবনা	৯	৯	-	-	-
৬	কুষ্টিয়া	৬	৬	-	-	-
৭	যশোর	৮	৭	১	-	-
৮	খুলনা	৮	৮	-	-	-
৯	বাখরগঞ্জ	২০	১৯	-	-	১
১০	ফরিদপুর	১৪	১৪	-	-	-
১১	ঢাকা	২৩	২৩	-	-	-
১২	মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	-	-	-
১৩	সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪	ত্রিপুরা	২২	১৫	২	-	৫
১৫	নোয়াখালী	১৩	১২	-	-	১
১৬	চট্টগ্রাম	১৩	১১	-	-	২
	মহিলা	৯	৯	-	-	-
	মোট	২৩৭	২১৫	৯	১	১২

নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাভুবি ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এবং আরো চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং কমপক্ষে ৫০ জন মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীর জামানত বাজেয়াঙ্গ হয়। নূরুল আমিন নিজ আসনে খালেক নেওয়াজ খান নামক ২৫ বৎসর বয়সী এক আইনের ছাত্রের নিকট প্রায় ৭,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আবদুল মাল্লান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র জনাব তাজউদ্দীন আহমদের নিকট প্রায় ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। মুসলিম লীগ সমর্থিত তফশিলি জাতি ফেডারেশন (বাকুরী গ্রুপ)-এর ভরাভুবি ঘটে।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে অবহেলা দেখান। ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক পুরাতন এবং জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য

বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগকেই দায়ী করে এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলা শাখা এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। লবণ, কোরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহবধূরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশুল্ক হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রতি চরম বিরোধিতা করে ১৯৫২ সালের হত্যাকা ঘটিয়ে দলের বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিকুল্ক করে তোলে। দীর্ঘ ৭ বৎসর সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ফলে নির্বাচনের প্রাক্তালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কোনো বক্তব্যই জনগণকে খুশি করতে পারেনি। অপরপক্ষে, ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী—এই তিনজনের নির্বাচনী প্রচারণার ফলে ‘দেশময় যে প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মতো ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া গেল।’

মুসলিম লীগের মুখ্যপত্র আজাদ পত্রিকা এই দলের প্ররাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করে:

সাধারণভাবে লীগের প্ররাজয়ের যেসব কারণ সর্বত্র আজকাল আলোচিত হইতেছে সেসবের ভিতর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এবং লীগের কতিপয় নীতি ও কার্যের প্রতিবাদ.... লীগের প্ররাজয়ের কারণগুলি হইতেছে: (১) বাংলাভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি; (২) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব; অবিচার ও শোষণ নীতি; (৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না- দেওয়ার প্রস্তাব ও অনোভাব; (৪) পূর্ববাংলা জনগণের আর্থিক দুর্দশা; (৫) শাসনতত্ত্ব রচনার বিলম্ব; (৬) লীগের গণসংখ্যাগের অভাব; (৭) লীগ ও মন্ত্রিত্বের একীকরণ; (৮) লীগের ভিতর বিপুল বাক্তিশালী নেতৃত্বের অভাব; (১০) দুর্নীতি দমনে সরকারি ব্যর্থতা এবং এইভাবে তালিকায় আরো কারণ যোগ করা যাইতে পারে।

নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদ সদস্যবৃন্দের সামাজিক পটভূমি

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে পরিষদ সদস্যদের সামাজিক পটভূমি নির্ণয় বর্তমানে দৃঃসাধ্য। নির্বাচিত সদস্যদের অনেকেই এখন জীবিত নেই। তাদের অধিকাংশের কোনো জীবনীগ্রন্থ লিখিত হয় নাই। অধ্যাপক নাজমা চৌধুরীর গবেষণাগ্রন্থ থেকে আমরা কিছু তথ্য পাই। তিনি ১৯৬৭-৬৯ সময়ে তার পি.এইচ.ডি গবেষণাকর্মের অংশ হিসেবে ১৯৫৪-এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট তাদের জীবনীর বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন। ৩২২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট প্রশ্নমালা প্রেরিত হলেও মাত্র ১২৩ জন (৩৮.২%) প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠান। উক্ত ১২৩ জনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক

চৌধুরী তাদের যে সামাজিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা সহজেই আমার হাতে আসব।

নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন বেশ বয়স্ক। ৬০-এর বেশি বয়স্ক সদস্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৭%, ৩০-এর কম বয়স্ক সদস্য সংখ্যা সেখানে মাত্র ৭%। ৪৫-এর অধিক বয়স্ক সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১%।

নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। আইন পাস সদস্য সংখ্যা ছিল লক্ষণীয় (৪৫%)। ডাক্তারি পাস ছিলেন ৫%। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ১৫%। ম্যাট্রিক পাস করেননি এমন সদস্যসংখ্যা ৬%, ম্যাট্রিক পাস ৬% এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস ৮%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নন-গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা ২০% (২৪ জন)। এদের মধ্যে ২ জন ধনী জমিদার পরিবারের সদস্য, ২ জন বড় জোতদার, ২ জন এমন পরিবারের সদস্য যে পরিবার থেকে ইতোপূর্বে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, ৫ জন মোকার, ৩ জন ত্রিচিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকায় পড়াশুনা করতে পারেননি, ১ জন বড় ব্যবসায়ী, ১ জন দীর্ঘদিন স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ১ জন বিপ-বী কর্মী। এরা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় সুপরিচিত হওয়ায় কম লেখাপড়া তাদের নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। নির্বাচিত সদস্যদের ৬% (৭ জন) ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে সকলেই কোনো ধর্মীয় সংগঠনের বা দলের সদস্য ছিলেন এমন নয়। উচ্চ ৭ জনের ১ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন নিজামে এছলামী থেকে, ৩ জন মুসলিম লীগ থেকে এবং ২ জন আওয়ামী লীগ থেকে। ১ জনের দলীয় পরিচয় জানা যায়নি। আওয়ামী লীগের সদস্যদ্বয় ১৯৪৭-এর পূর্বে মুসলিম লীগ দলের সদস্য ছিলেন।

নির্বাচিত সদস্যদের পেশার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, আইন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক- ৫১%। জমিদার ভূস্বামী ১১%, শিক্ষাবিদ ৯%, সাংবাদিক ৩%, ডাক্তার ৬%, অন্যান্য ৯%। কেউই শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেননি। অন্যান্য বলতে ধর্মপ্রচার করা, সার্বক্ষণিক রাজনীতি করা, সার্বক্ষণিক জনসেবা করা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।

১৮৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মাত্র ১৪%-এর ইতোপূর্বে কোনো না কোনো আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫৪ সালে গঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদ পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। তবে অন্তত ২৫% সদস্যের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানে (ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) সংশ্লিষ্ট থাকার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল।

পর্যালোচনা

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যাধিক। পূর্ববাংলায় এটি ছিল প্রাণবয়স্কদের প্রত্যক্ষভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শাস্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের যতান্ত প্রকাশের সুযোগ লাভ

করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সম্ভবহার করেছে। নির্বাচনে মুজফ্ফর দলের দাবির সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ববাংলার স্বায়ত্ত্বাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যাহাস পায়, ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলায় সেই-যে মুসলিম লীগের পতন ঘটল, এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে পারেনি।

৪. যুক্তফন্ট সরকারের শাসনামল

যুক্তফন্টের সরকার গঠন

নির্বাচনে মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী প্রার্থী হননি। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করবেন বলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশ নেননি। নির্বাচনে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অংশ না-নেয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পূর্ববাংলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান এবং তার নেতৃত্ব ও এপ্রিল (১৯৫৪) চার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির সৈয়দ আজিজুল হক ও আবু হোসেন সরকার এবং নেজামে এছলামীর মৌলভী আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে কৃষক শ্রমিক-পার্টির আবদুল হাকিম এবং আওয়ামী লীগের শাহেদ আলী। নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় কেন্দ্রীয় সরকার সুনজরে দেখেনি। স্বভাবতই তারা যুক্তফন্টের ভঙ্গন চেয়েছে। এমতাবস্থায় যুক্তফন্টের শরিক দলগুলির সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে শুরুতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন নিয়ে মনমালিন্য শুরু হয়। ও এপ্রিল ফজলুল হক যে ও জনকে মন্ত্রি পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেন তাদের ২ জন তার দলের এবং ১ জন নেজামে এছলামীর। এ সময় আওয়ামী লীগ বাদ পড়ে।

যুক্তফন্ট মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় দাস্য নির্বাচন নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মতানৈক্য ঘটে। আওয়ামী লীগের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমানের নাম ছিল। ফজলুল হক এই দুজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিলেন না। ১৫ মে পর্যন্ত এ বিষয়ে আপোষ হয়নি। ইতোমধ্যে ফজলুল হকের কলিকাতা ভ্রমণকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর ফজলুল হক ৩০ এপ্রিল সরকারি সফরে কলিকাতা যান এবং সেখানে বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় যেসব ভাষণ দেন তার মূল কথা ছিল:

রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিতীয় হয়ে থাকলেও বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বের যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তা দুটি বাংলায়ই বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বর্তমান থাকবে।

ফজলুল হকের এসব মন্তব্যে মুসলিম লীগ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান করার সম্ভাবনা আছিল। তাকে অপসারণের উপায় খুঁজে পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপিত হলো যে তিনি ভারতের কাছে পূর্ববাংলাকে বিক্রি করে দিতে চান।

এমতাবস্থায় ফজলুল হক আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন। ১৫ মে (১৯৫৪) আওয়ামী লীগ দলীয় কিছু সদস্যকে, এমনকি তার অপছন্দনীয় শেখ মুজিব ও আতাউর রহমান খানকে তিনি তার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু চক্রান্তকারীর এই নতুন মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য নানান ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা অত্যন্ত সূচতুরভাবে পূর্ববাংলার শিল্প-এলাকাগুলোতে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙা বাঁধিয়ে দিয়ে অভিযোগ উথাপন করে যে, প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যুক্তফুল্ট সরকার ব্যর্থ। এ সময় একজন সাংবাদিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে সাহায্য করে। এ. কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে উপস্থিত হতে করাচি গেলে ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এর সংবাদদাতা জন.পি কালাহান তার এক সাক্ষাত্কার গ্রহণ করে এবং ২৩ মে সাক্ষাত্কারটি বিকৃত করে প্রকাশ করেন। উক্ত সাক্ষাত্কারে ফজলুল হক পূর্ববাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া উচিত বলে অভিযোগ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কালাহান লেখেন যে, ফজলুল হক পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চান। রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে হক সাহেব এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মি. কালাহানের রিপোর্টটিই বিশ্বাস করে এবং ফজলুল হককে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে।

আসলে যুক্তফুল্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফুল্ট সরকারকে বরখাস্ত করার নানান উপায় খুঁজতে থাকে এবং তারই প্রেক্ষিতে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উথাপন করতে থাকে। অবশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ মে (১৯৫৪) পূর্ব বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশের ওপর গভর্নরের শাসন জারি করে। পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন ১৯৫৫ সালেই জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। ইতোমধ্যে ১৭ মে মেজর জেনারেল ইঙ্কান্দার মীর্জাকে পূর্ববাংলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। এক্ষণেই তিনিই গভর্নর হিসেবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। তিনি পূর্ব বাংলায় আসের রাজত্ব কায়েম করেন। গভর্নরের শাসনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফুল্টের ৬৫৯ জন সদস্য কর্মীকে ফ্রেক্ষনার করা হয়। সে সময় ১ জন যুক্তফুল্ট মন্ত্রী (শেখ মুজিবুর রহমান) এবং ১৩ জন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকেও ফ্রেক্ষনার করা হয়। জুনের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় এক হাজার বাঙালিকে বন্দি করা হয়। ফজলুল হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দলের অনেক নেতা ও কর্মীকে বন্দি করা হয়। গভর্নরের শাসন জারির সময় মণ্ডলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী বিদেশে অবস্থান করেছিলেন। ফলে নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে গভর্নরের শাসন জারি করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব বাংলায় কোনো প্রতিবাদ কিংবা মিছিল-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি।

এইভাবে সন্দেহজনক সকল বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে বন্দি করার পর কেন্দ্রীয়

সরকার পূর্ববাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের উদ্দেশ্য প্রাপ্ত করে। যে ফজলুল হককে দেশান্তরী আখ্যা দেয়া হয়েছিল তাকেই পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আঁতাত করার সুযোগ পেয়ে পূর্ববাংলায় তার দলের (কৃষক-শ্রমিক পার্টি) সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তদবির করতে থাকেন। যদিও যুক্তফুন্টে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তথাপি আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে যুক্তফুন্ট ভেঙে যায়। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (বঙ্গড়ার মোহাম্মদ আলী) সঙ্গে দেখা করে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগ দানের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। মোহাম্মদ আলী স্বীকার করেন যে, প্রাদেশিক পরিষদে বৃহস্পতি দলের নেতা হিসেবে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী দাবি করতে পারেন, কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কীভাবে একজন কম্যুনিস্টকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করবেন? আতাউর রহমান খানকে কম্যুনিস্ট বলার কারণ এই যে, তিনি ১৯৫২ সালে পিকিঙে অনুষ্ঠিত শাস্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নেতা যোগদান করেও কম্যুনিস্ট আখ্যা পাননি, কিন্তু আতাউর রহমান খানকে কম্যুনিস্ট বলা হল। উদ্দেশ্য একটাই, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে ফজলুর হকের দলকে ক্ষমতা দেয়া এবং এইভাবে যুক্তফুন্টকে বিপ্রতি করা। যুক্তফুন্টের মধ্যে ভাঙ্গ ধরানোর কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা অচিরেই সফল হয়।

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, যুক্তফুন্ট গঠনের সময় এ. কে. ফজলুল হককে পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই সুবাদে তিনি যুক্তফুন্টে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই যখন আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে পূর্ববাংলা সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা শুরু করেন তখন স্বত্ত্বাতই যুক্তফুন্টের আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারি নেতা হিসেবে ফজলুল হকের প্রতি অনাঙ্গীকার উত্থাপন করে। কিন্তু এতে আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীত হয়। ৩২ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য পার্টি পরিবর্তন করে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করে। এই ধারা অব্যাহত থাকে, ফলে ২ এপ্রিল (১৯৫৫)-এর মধ্যেই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যসংখ্যা ১৪০ থেকে ৯৮-এ নেমে আসে। তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩৪ থেকে বেড়ে ৬৯ হয় এবং নেজামে এছলামী সদস্য সংখ্যাও বেড়ে ১২ থেকে ১৯ হয়। তাছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ বাদ দেবার কারণে ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে দলবদ্ধ হয় এবং তারা কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে এছলামীকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন হয়। এইভাবে যুক্তফুন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে এছলামী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ। গণতন্ত্রী দল ও

কমিউনিস্ট দলের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, অন্ত পর্যন্ত বিশ্বকর্তে রক্ষণাত্মক পার্টি ও কিছু হিন্দু-সদস্য ফজলুল হকের জোটকে সমর্থন দেন। এইভাবে পূর্ববাংলায় যুজ্ঞন্টভুক্ত মুসলিমান সদস্যবৃন্দ দুই ধারায় বিভক্ত হয়। আওয়ামী লীগের ধারাটি ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে গ্রহণ করে, অপরপক্ষে ফজলুল হকের জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার কেবল যুজ্ঞন্ট ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হয় না, তার সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগকে বামপন্থীদের সমালোচনার সম্মুখীন করে। ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী-উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, অথচ পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমোদন দেয়। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী পরিষদের যোগদান করে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইছলামী, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস নবনিযুক্ত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি প্রাদেশিক আইনপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আঙ্গা ও সমর্থন আছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষদের অধিবেশন আহবানের দাবি করা হলেও সরকার পরিষদের অধিবেশন আহবান করতে অস্বীকার করেন। এমনকি পরবর্তী আট মাসের আইনপরিষদের কোনো সভা আহবান করা হয়নি। উপরন্তু আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার অন্তিম রক্ষার্থে ১৯৫৬ সালে ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ববাংলার গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন। গভর্নর পদে যোগদান করে ফজলুল হক ২২-৫-৫৬ তারিখে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভার পতন হবে-এই আশঙ্কায় গভর্নর ২৪ মে (১৯৫৬) আইনসভার অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছে না এই কারণ দেখিয়ে জরুরি ক্ষমতা বলে এখানে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। সাত দিন পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল করা হয়। যদিও তখন আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো এবং সংসদে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদানের সুযোগ দেয়াই সংসদীয় রীতি ছিল, কিন্তু তা উপেক্ষিত হয়।

ফজলুল হকের গভর্নর পদ লাভ ও তার দলের মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি লাভের পিছনে মুসলিম লীগকে দেয়া তাদের ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রূতি ছিল। প্রথমত পাকিস্তান মন্ত্রী পরিষদে পাস করার জন্য যে খসড়া সংবিধান পেশ করা হবে তা তার দল সমর্থন করবে। দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি সমর্থন করবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদসহ মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সুযোগ লাভের বিনিময়ে ফজলুল হক দল উপরিউক্ত প্রতিশ্রূতি রক্ষা করেছিল। তারা পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া-সংবিধান সমর্থন করে। অপরদিকে গণপরিষদে খসড়া-সংবিধানে পাকিস্তানকে ‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র’ রূপে ঘোষণা করাকে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে

বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগ সংবিধানে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা ও পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্ত্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি করে। কিন্তু গণপরিষদে কৃষক-শ্রমিক পার্টি মুসলিম লীগকে সমর্থন করায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার সংবিধান পাস করিয়ে নিতে সমর্থ হন। আওয়ামী লীগ গণপরিষদ থেকে উয়াকআউট করে এবং সংবিধানে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। তবে সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

কৃষক-শ্রমিক পার্টি যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা বিরোধিতা করায় পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। এ সময় পূর্ববাংলায় আবু হোসেন সরকারের কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতি কেবলমাত্র নেজামে এছলামী সমর্থন অব্যাহত রাখে। এমনি অবস্থায় ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাদেশিক আইনপরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়। কিন্তু আইনপরিষদে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা আঙ্গ ভোটের সম্মুখীন হলে সুনিশ্চিত পরাজিত হবে বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদ্রব্যে গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক উক্ত পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এভাবে পুনরায় আবু হোসেন সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কিন্তু তারা প্রাদেশিক সরকারের পতন ঠেকাতে পারেনি। ইতোমধ্যে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটার পর ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই কোয়ালিশন সরকার গণতন্ত্রী দল, রফিক হোসাইন-এর নেতৃত্বাধীন ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ অংশ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের প্রতি ২০০ জন সদস্যের সমর্থন ছিল। এই ২০০ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল ৯৮ জন, গণতন্ত্রী দলের ১২ জন, সংখ্যালঘু ৭২ জন এবং ১৮ জন আওয়ামী মুসলিম লীগের।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ৫ দিন পর কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগ থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে যেয়ে রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেছিলেন। তখন পাকিস্তান গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ এবং রিপাবলিকান পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন। তাছাড়া গণপরিষদের ১ জন গণতন্ত্রী দলীয় সদস্য ও ৭ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য আওয়ামী লগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকারের প্রতি

সমর্থন জ্ঞান করেন। ফলে গণপরিষদে কোয়ালিশনের পক্ষে সমস্যা সংক্ষেপ হয়।

একই সঙ্গে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অংশীদার হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ববাংলায় অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল জোতদারশ্রেণী এবং উঠতি বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী। এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে জুট ট্রেডিং করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্ববাংলা প্রদেশ পাওয়ার-স্টেশন নির্মাণ, শিল্পের বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। পূর্ববাংলার ব্যবসায়ীদের অনুকূলে আমদানি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এখানকার ধনী কৃষক ও জোতদারশ্রেণী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাদের পুঁজি যাতে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করতে পারে সে জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলায় ২ বৎসরের শাসননামলে (মাঝে মধ্যে বিরতিসহ) আওয়ামী লীগ সরকার ফেডুগঞ্জে গ্যাস কারখানা স্থাপন করে; সাভারে ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন, ঢাকা-আরিচা, নগরবাড়ি-রাজশাহী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ করে; ঢাকা শহরে রমনা পার্ক গড়ে তোলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধার জন্য ওয়াটার এ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওয়াপদা) প্রতিষ্ঠা করে, ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও এফ.ডি.সি (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা করে। সরকার ভাষা শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। বাংলা একাডেমী বাংলায় পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বল্পকালীন শাসননামলে আরো যে-সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: প-জ্যানিং বোর্ড গঠন, তিন বছর উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রণয়ন, শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন, আলিয়া মাদরাসার ভবন নির্মাণের জন্য প্রথমবারের মতো চল্লিশ হাজার টাকা অনুমোদন, ময়মনসিংহে পশ্চ চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, কৃষিখণ সার্টিফিকেট খণ বাতিল, বন উন্নয়ন, স্থায়ী শিল্প ট্রাইবুনাল গঠন, ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা এবং গ্রেটার ঢাকা সিটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইত্যাদি।

অতএব বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকার তার স্বল্পকালীন শাসননামলে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

কিন্তু আওয়ামী লীগের শাসনামল শাস্তিপূর্ণ হতে পারেনি। কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সম্ভাবনের মধ্যেই সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে কোন্দল দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার সময় থেকেই অনেক বামপন্থী নেতা-কর্মী এই পার্টিতে চুকে পড়ে। পার্টির এই অংশ ভাসানীর নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি এবং পূর্ববাংলার সরকারের লাইসেন্স পারমিট বিতরণ নীতির কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। মাওলানা ভাসানী প্রকাশ্য সমালোচনা করে বলেন যে, “আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেছে তা পার্টির মেনিফেস্টো বিরোধী। এভাবে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দুটি

ভিন্নমতালম্বী গ্রন্থের সৃষ্টি হয়।

বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং আওয়ামী লীগে অবস্থানরত বামশক্তির প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত মণ্ডলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে ইস্তাফা দেন (১৯৫৭ সালে ২৪ জুলাই) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ) গঠন করেন। তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ন্যাপ গঠনের ফলে প্রাদেশিক পরিষদের ২৮ জন সদস্য আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে নবগঠিত ন্যাপ-এ যোগ দেন। এই সুযোগে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগ-আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর চক্রান্ত শুরু করে। এই চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১১ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং রসরাজ মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এমতাবস্থায় সরকার আসন্ন আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু গভর্নর পদে তখন ফজলুল হক অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি উল্টো মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন (৩১-৩-৫৮) ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান (৩১-৩-৫৮)। এ সময় কেন্দ্রে ফিরোজ খান নূনের মন্ত্রিসভা আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে ছিল। স্বত্বাবতই পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার গভর্নরকে (এ. কে. ফজলুল হক) বরখাস্ত করেন (১-৪-৫৮)। পূর্ববাংলার চিফ সেক্রেটারিকে অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হয়। নতুন অস্থায়ী গভর্নর আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনর্বাহাল করেন (১-৪-৫৮)। সরকার আইনপরিষদে আস্থা ভোট দেন এবং ১৮-২-১১৭ ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু এর দেড় মাস পরেই (১৮ জুন ১৯৫৮) পরিষদে খাদ্য পরিষ্কারির ওপর ভোটাত্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার (১২৬-১৩৮) ভোটে হেরে যায়, তখন ন্যাপ ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে ১৯ জুন (১৯৫৮) মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং ২০ জুন তদন্তলে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট সমর্থনের প্রতিশ্রূতি দিয়ে ন্যাপের সমর্থন আদায় করে। ন্যাপের সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগে আইন পরিষদে (২৩-৬-৫৮ তারিখে) আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে অনাস্থা ভোটে (১৫৮-১৪২) পরাজিত করে। কিন্তু তখন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় (২৫-৬-৫৮)। দুইমাস পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয় (২৫-৮-৫৮)।

এইভাবে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। ১৯৫৮ সালের বাজেটের ব্যাপারে চারটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু আগস্ট পর্যন্ত বাজেট পাস সম্ভব হয় না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে আইনপরিষদে এক কলকাজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং অক্টোবরে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইনপরিষদের অবসান ঘটে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, আইন পরিষদের স্পিকার (জনাব আবদুল হকিম) ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির এবং ডেপুটি স্পিকার (জনাব শাহেদ আলী) ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। যুক্তফুন্ট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কখনো কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার আবার কখনো আওয়ামী লীগের সরকার দেশ পরিচালনা করে। ১৯৫৮ সালের আওয়ামী লীগ স্পষ্টত অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্পিকার আবদুল হকিম নিরপেক্ষ নন। এই প্রেক্ষিতে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) আবদুল হকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী এম. পি. অনাস্তা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পিকার এক রুলিং দিয়ে তা বাতিল করেন। ফলে পরিষদ ভবনের মধ্যে গোলযোগ হয়। স্পিকার পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন। তখন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় দেওয়ান মাহবুব আলী স্পিকারের বিরুদ্ধে তার অনাস্তা প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলে ১৭০ জন সদস্য তা সমর্থন করেন। ডেপুটি স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা গৃহীত হয়। অতঃপর পিটার পল গোমেজ নামক একজন এম.পি. স্পিকার আবদুল হকিমের মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাও গৃহীত হয়। এরপর স্বতাবতই স্পিকার আবদুল হকিম আর স্পিকার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্যবৃন্দ এই পরিবর্তন মানেনি। পরবর্তী ২ দিন চেয়ারম্যান প্যানেলের সদস্য সৈয়দ আজিজুল হকের সভাপতিত্বে স্বল্প সময়ের জন্য অধিবেশন চলে। কিন্তু তার পরদিন (২৩ সেপ্টেম্বর) ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী স্পিকারের চেয়ারে বসামাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার সমর্থক দলের সদস্যবৃন্দ জনাব শাহেদ আলীকে উক্ত চেয়ারে আসন গ্রহণ না করার দাবি করে। কিন্তু শাহেদ আলী আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বিভিন্ন বন্ধ নিষ্কেপ হতে থাকে। এ বিষয়ে কৃষক-শ্রমিক পার্টির সমর্থক পত্রিকা ‘আজাদ’ রিপোর্ট করে:

ঐ সময় একটি বন্ধ ডেপুটি স্পিকারের উপর নিষ্কিণ্ড হওয়ায় তিনি মুখে আঘাত পান এবং আহত হান হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। নিষ্কিণ্ড বন্ধটি সম্ভবত সদস্যদের ডেক্সের সহিত সংযুক্ত লেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ভগ্নাংশ।

আহত অবস্থায় শাহেদ আলীকে হাসপাতালে নেয়া হয় সেখানে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) বেলা ১:২০ মিনিটে ইন্সেকাল করেন। এই ঘটনা পূর্ববাংলা জাতীয় পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এরপর ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে।

যুক্তফুন্ট শাসনকাল পর্যালোচনা

১৯৫৮ সালের সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে যুক্তফুন্ট জয়লাভ করলে এই প্রদেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু মুসলিম লীগ দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে এবং সর্বোপরি যুক্তফুন্টের শরিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংখ্যালঘু সংসদ-সদস্যদের ঘন ঘন সমর্থন বদলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বৎসরে সাতটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গড়নের শাসন জারি করা হয়। ফলে বহু প্রত্যাশিত ২১ দফার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি এবং দেশের উন্নয়ন সাধনের যে সুযোগ

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ পেয়েছিলেন তা তারা নিজেদের সংকীর্ণ দলায় আবে কাজে লাগাতে পারেননি। উপরন্ত যুজফন্ট ভূক্ত একটি দলের (কৃষক-শ্রমিক পার্টি) এম.পি.-দের দ্বারা অন্য দলের (আওয়ামী লীগের) সমর্থিত স্পিকারকে পিটিয়ে হত্যা করা চুয়ান্নার নির্বাচনে গঠিত আইন পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

সহায়ক এছ

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০
আবু আল সাইদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৬

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুক্ত : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮২
বদরুজ্জীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তিন খণ্ড, ঢাকা, ২০১১

বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৫।

জয়সূত কুমার রায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা, ২০০৯

মুনতাসীর মামুন ও জয়সূত কুমার রায়, বাংলাদেশে সিডিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ঢাকা, ২০১৩।

Android Coding Bd